স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

ভক্তি-রহস্য

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. ভক্তির সাধন........2
২. ভক্তির প্রহম সোপান-তীব্র ব্যাকুলতা........1 3
৩. ভক্তির আচার্য-সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ........2 6
৪. প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা........4 1
৫. প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত........5 1
৬. ইষ্ট........6 4
৭. গৌণী ও পরাভক্তি........7 7

১. ভক্তির সাধন

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥১

বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার জন্য ব্যাকুল আমার এই হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়।

প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—টাকাকড়ি, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও সম্পত্তিতে—তাহাদের কি দারুণ প্রীতি, কি প্রচণ্ড আসক্তি! তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, 'আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবলভাবে অনুরক্ত হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নয়।' এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহা 'ভক্তি' আখ্যা লাভ করে। ভক্তিতে কিছুই ধ্বংস করিতে হয় না। ভক্তিযোগে বলা হয়, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নয়, বরং ঐগুলির সাহায্যেই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তি কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নষ্ট করে না,—ভক্তি প্রকৃতির বিরোধী হয় না, শুধু মোড় ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে চালিত করিয়া দেয়।

আমরা কত স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি ভালবাসি, ঐগুলিকে না ভালবাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না, কারণ ঐগুলি আমাদের নিকট পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে অবস্থিত—কোন সত্য অনুভব করে, তখনও তাহার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু—ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্বে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকেই 'ভক্তি' বলে।

রামানুজাচার্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন-প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ ‘বিবেক’। এই বিবেক-সাধনটি বিশেষতঃ পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট একটি অদ্ভুত জিনিষ। রামানুজের মতে ইহার অর্থ ‘খাদ্যাখাদ্যের বিচার।’ যে-সকল উপাদানে দেহ ও মনের বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেইগুলি বিদ্যমান; আমি এখন যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিতেছি, তাহার সবই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল; আমার দেহমনের ভিতর উহা পরিবর্তিত, সঞ্চিত ও নূতনদিকে চালিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। বহির্জগতে জড়বস্তু ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, দেহ মন এবং খাদ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। তাই যদি হইল, অর্থাৎ যদি আমাদের খাদ্যের জড়কণাগুলি হইতে আমরা চিন্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ কণাগুলির মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা চিন্তাও উৎপন্ন করি, তবে ইহাও সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, এই চিন্তাশক্তি ও তাহার যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবে, বিশেষ প্রকার খাদ্য মনে বিশেষ প্রকার পরিবর্তন উৎপাদন করিবে; প্রতিদিনই আমরা ইহা দেখিয়া থাকি। আরও কত প্রকার খাদ্য আছে, সেগুলি শরীরে পরিবর্তন সাধন করে, পরিণামে মনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ইহা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় তত্ত্ব; আমরা যত দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই আমাদের আহার হইতে জাত। আপনারা দেখিয়াছেন, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত করা বড়ই কঠিন, তখন মন অবিরত ছুটিতে থাকে! কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক–সেইগুলি খাইলে দেখিবেন, মনকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। অধিক পরিমাণে সুরা বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য পান করিলে মানুষ বুঝিতে পারে, মনকে আর সংযত রাখা যাইবে না। মন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

রামানুজাচার্যের মতে খাদ্যসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ ‘জাতিদোষ’। জাতিদোষ-অর্থে সেই খাদ্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ বুঝায়। সর্বপ্রকার

উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা—মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ উহা স্বভাবতই অপবিত্র। অন্যের প্রাণনাশ করিয়া তবে মাংস পাইতে পারি। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখ পাই, আর আমাদের সেইটুকু সুখের জন্য একটি প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এজন্য আমরা মানুষেরও অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে সেই প্রাণীটি হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়া লয়, আবার সেই হত্যাকার্যের জন্য সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে। এখানকার আইন জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখনও জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না—ভাবটা এই যে, কসাই স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর। তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে?—সমাজ। আমরা যদি মাংস ভক্ষণ না করিতাম, তবে কেহ কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহারাই করিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হয়, এবং যাহারা ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ্য, যথা—পেঁয়াজ, রসুন, সাওয়ারক্রট (Sauerkraut)২ প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ খাদ্যও বর্জন করিতে হইবে।৩

খাদ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দোষের নাম 'আশ্রয়দোষ'। পাশ্চাত্যগণের পক্ষে এটি বুঝা আরও কঠিন। 'আশ্রয়দোষ' অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার সংস্পর্শে খাদ্যে যে দোষ জন্মে। এটি হিন্দুদের একটি রহস্যপূর্ণ মতবাদ। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে এক প্রকার জ্যোতি রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাতেই যেন তাহার প্রভাব, তাহার মনের—তাহার চরিত্রের বা ভাবের কিছু অংশ লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে তাহার শক্তির মত চরিত্রবৈশিষ্ট্যও যেন বহির্গত হইতেছে, আর ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাই তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সে-দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি

ভক্ত হইতে চান, তিনি যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রামিত হইবে।

তৃতীয় 'নিমিত্তদোষ'। এটি বুঝা খুব সহজ। খাদ্যে ধূলি প্রভৃতি সংস্পর্শ যেন কখনও না হয়। বাজার হইতে রাজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর রাখা ঠিক নয়। থুতু, লালা প্রভৃতি হইতেও সাবধান হইতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিষ ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন! অতএব ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া লালা দ্বারা সব জিনিষ স্পর্শ করার মত কদর্য অভ্যাস আর কিছুই নাই। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ, এগুলি হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রামিত হয়। কোন দ্রব্যে লালার স্পর্শ–শুধু দোষাবহ নয়, বিপজ্জনক। তারপর একজন যে জিনিষের আধখানা কামড়াইয়া খাইয়াছে, তাহা খাওয়া উচিত নয়; যথা, একজন একটা আপেল এক কামড় খাইয়া বাকীটা অপরকে খাইতে দেয়, এরূপ করা উচিত নয়। খাদ্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দোষগুলি বর্জন করিলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। আহারশুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে–'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' ৪

রামানুজাচার্যের উপনিষদের ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একজন ভাষ্যকার–শঙ্করাচার্য ঐ বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। 'আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'– যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার, সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আহার। তিনি কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন? 'আহারশুদ্ধি'র প্রকৃত অর্থ–ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত না হওয়ার জন্য আমাদের এই দোষগুলি বর্জন করিতে হইবেঃ প্রথমতঃ আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে; ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয়ে প্রবল আসক্তি থাকিবে না। সব দেখুন, সবকিছু করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, নিজের উপর তাহার কোন প্রভুত্ব থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন নারী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে ঐ পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে; পুরুষও তেমনি

নারীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার তো কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় কাজ আছে। সকলকেই ভালবাসুন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ উহা তো আমাদিগকে অধঃপতিত করিয়া দেয়; দ্বিতীয়তঃ উহাতে অপরের প্রতি ব্যবহারে আমাদিগকে ঘোর স্বার্থপর করিয়া তুলে, এই দুর্বলতার দরুন আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে চাই। জগতে যত কিছু অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্মে আসক্তি রাখিতে হইবে, এবং সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া যেন আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। ঈর্ষা বা দ্বেষ সমুদয় অনিষ্টের মূল, আর উহা জয় করা বড়ই কঠিন। তৃতীয়তঃ মোহ। আমরা সর্বদাই এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদনুসারে কার্য করিতেছি, আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেরাই সৃষ্টি করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকে সর্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিয়া যাইতেছি; কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব আঘাত পাইয়াছি, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি, এবং অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভুল লইয়া থাকি। শঙ্করাচার্যের মতে এই পূর্বোক্ত রাগদ্বেষমোহরূপ ত্রিবিধদোষ-বর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া, রাগদ্বেষমোহ-বর্জিত হইয়া চিন্তা করিতে পারে। এইরূপে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন চলিতে থাকে।

স্বভাবতই আপনারা সকলে বলিবেন যে, শঙ্করাচার্যকৃত এই ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। তাহা হইলেও বলিতেছি, রামানুজকৃত ব্যাখ্যাটিকে অবহেলা করা চলিবে না। স্থূল খাদ্য শুদ্ধ হইলে বাকীগুলিও শুদ্ধ হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু

আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নন। জড়পদার্থের শক্তি দ্বারা আমরা সকলেই চালিত হই, এবং যতদিন আমরা এইভাবে চালিত হইব, ততদিন আমাদিগকে জড়ের সাহায্য লইতেই হইবে; তারপর যখন আমরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিব তখন যাহা খুশী পানাহার করিতে পারি। আমাদিগকে রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানসিক আহার'-এর দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।, শরীরের স্থূলখাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া তো অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহা হইলে আমাদের আত্মচেতনা ক্রমশঃ সবল হইতে থাকিবে, এবং শরীরচেতনার দাবী ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। তখন আর কোন খাদ্যই আমাদের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সকলেই এক লাফে উচ্চতম আদর্শ ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তো কিছু হইবে না! তাহাতে পড়িয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত পা খোঁড়া হইয়া যাইবে। আমরা এই জগতে বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে শিকল ভাঙিতে হইবে। রামানুজের মতে এই 'বিবেক' অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্য-বিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক-শব্দের অর্থ বাসনার দাসত্ব-মোচন। যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্বপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই কামনা করিও না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জীবনে লইয়া যাইবার জন্য যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল উচ্চতর উদ্দেশ্যলাভে যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। আমরা সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, এই জগৎ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, একটি উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা এই স্থূলদেহেই অমরত্ব লাভ করিতাম, আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্তে আমাদের চতুর্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মূর্খতাবশতঃ ভাবিতেছি, আমরা কখনও মরিব না।৫ ঐ ধারণা হইতে আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবন আমাদের চরম লক্ষ্য—আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতা লাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ভাল; আর যখন ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না,

তখন ইহা মন্দ—মন্দ বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, টাকা-কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্তু যখনই তাহা না হয়, তখন সেগুলি মন্দ বৈ আর কিছুই নয়। স্ত্রী যদি ঈশ্বরলাভের সহায়তা করে, তবেই তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়—এইরূপ পতিপুত্রাদি সম্বন্ধেও। অর্থ যদি মানুষকে অপরের কল্যান-সাধনে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্টের মূল, আর যত শীঘ্র আমরা অর্থের সংস্রব হইতে নিষ্কৃতি পাই, ততই মঙ্গল।

পরবর্তী সাধন 'অভ্যাস'। আমাদের কর্তব্য—মন যেন সর্বদাই ঈশ্বরাভি-মুখে গমন করে, অন্য কোন বস্তুর আমাদের মনকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মন যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বরচিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কাজ, কিন্তু বারংবার অভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্ভব। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইবে। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন। একদিকে মোড় ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন, এবং যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, আমরা এই মুহূর্তে হাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য বায়ুপ্রবাহেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুকরা খাদ্যের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়—ইহার উপর আমরা আবার নিজদিগকে 'আত্মা' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং অনেক বড় বড় বাজে কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাস—ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত হইয়া নিজেদের এই অবস্থায় আনিয়াছি। এখন বিপরীত দিকে চল, ঈশ্বরের চিন্তা কর—মন কোন শারীরিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন মন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দাও, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। 'যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে,

সেইরূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।' এই অভ্যাস আবার শুধু মনের দ্বারা করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া, আমাদিগকে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হইবে; বাজে কথা না বলিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক কথা বলিতে হইবে; বাজে পুস্তক না পড়িয়া ঈশ্বর-বিষয়ক সদ্গ্রন্থ পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই 'অভ্যাস' -এর সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ–সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান্ বলিতেছেনঃ

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করে, আমি সেখানেই অবস্থান করি।

মনুষ্য-মনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব–উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়। দেখিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিগণ–যাহারা এক মুহূর্তও মন স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

পরবর্তী সাধন 'ক্রিয়া'–পরের হিতসাধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বরচিন্তা আসিবে না। যতই আমরা পরের কল্যাণ-সাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে, এবং সেই হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া বা কর্ম পঞ্চবিধ–উহাদিগকে 'পঞ্চ-মহাযজ্ঞ' বলে। প্রথমঃ ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ স্বাধ্যায়–প্রত্যহ শুভ ও পবিত্র-ভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পাঠ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ঃ দেবযজ্ঞ–ঈশ্বর, দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়ঃ পিতৃযজ্ঞ–আমাদের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য।

চতুর্থঃ নৃযজ্ঞ—মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহারই জন্য যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি কেহ কেবল নিজের ও নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্মাণ করে, তবে উহা অতি ঘোর স্বার্থপর কাজ। এরূপ ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে হইবে—পরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধিকার।৬ ভারতে সাধারণতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নূতন নূতন জিনিষ, যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি কিছু কিনিয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। তারপর তিনি নিজে খাইয়া থাকেন। আর এদেশে (আমেরিকায়) অনুসরণ করিবার পক্ষে এটি একটি খুবই ভাল দৃষ্টান্ত। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইবে, আবার স্ত্রীপুত্রাদিও ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার। দরিদ্রগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—যাহারাই কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পরকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে। ৭

পঞ্চমঃ ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ নিম্নতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য। সকল জীবজন্তুকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুশী করিবে, এইজন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে—এ-কথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নয়। শরীরের কোন অংশে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য একটি প্রাণীকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি! এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই—যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সরকার এরূপ কার্যে যতই উৎসাহ দিক্ না কেন, হিন্দুরা যে এ-বিষয়ে সহানুভূতি করেন না, তাহাতে আমি খুশী। যাহা হউক, গৃহে রান্না-করা আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এদেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ খঞ্জ বা আতুর,

ঘোড়া, গরু, কুকুর, বিড়ালের জন্যও হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং যত্ন করিতে হইবে।

তারপর ‘কল্যাণ’ অর্থাৎ পবিত্রতা। নিম্নলিখিত গুণগুলি কল্যাণ-শব্দবাচ্যঃ ১ম, সত্য; যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে; যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সহজ সরল পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর নাই। সে-ই হীনতম ব্যক্তি, যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে; সে প্রতিগ্রহ করিতে—পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার হাত পরের দিকে ফিরানো রহিয়াছে—যে পরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নির্মিত হইয়াছে—কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন; পরকে খাদ্য দিতে গিয়া যদি তোমার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তাহারা তো পূর্ব হইতেই বদ্ধ। তাহারা সব দান করিয়া দিতে পারে না। তাহারা সন্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেমেয়ে নাই?স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, আমার নিজের একটি সন্তান চাই। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।

পরবর্তী সাধন ‘অনবসাদ’, ইহার ঠিক অর্থ—চুপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া, অর্থাৎ প্রফুল্লতা; নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্ল থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। যাহাদের মন সর্বদা বিষণ্ন ও তমোভাবে আচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভালবাসিবে কি করিয়া? তাহারা যদি ভালবাসার কথা বলে, তবে জানিবেন—উহা মিথ্যা; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরকে আঘাত

করিতে চায়। গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের মুখ সর্বদা ভার হইয়াই আছে–তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই যেন বাক্যে ও কার্যে পরের বিরোধিতা করা। অতীতে তাহারা কি করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং অবাধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলে এখনও কী করিতে পারে, তাহাও ভাবুন। ক্ষমতা করায়ত্ত হইবে জানিলে তাহারা আগামী কালই সমগ্র জগৎকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে, কারণ বিষণ্ণভাবই তাহাদের ঈশ্বর। ক্ষমতাপন্ন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া, সর্বদা বিষণ্ণ থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে আর ভালবাসার লেশমাত্র থাকে না, কাহারও প্রতি তাহাদের এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। 'আমি বড় দুঃখী!'–এরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। বাস্তবিকই যদি আপনার দুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখনই ভগবানকে লাভ করিতে পারে না–অতএব দুর্বল হইবেন না। আপানাকে শক্ত সবল হইতে হইবে–অনন্ত শক্তি আপনার ভিতর। নতুবা কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? ঈশ্বর-লাভ করিবেন কিরূপে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অনুদ্ধর্ষ' সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ষ-শব্দের অর্থ অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ঐ অবস্থায় মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে, আর পরিণামে সর্বদা দুঃখই আসিয়া থাকে। কথায় বলে, 'যত হাসি, তত কান্না'। মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। মনকে প্রফুল্ল অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন যেন কখনও কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

রামানুজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন।

২. ভক্তির প্রহম সোপান-তীব্র ব্যাকুলতা

ভক্তিযোগের আচার্যগণ নির্ণয় করিয়াছেন—ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু 'মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। জীবনের সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই প্রকার আদর্শ দেখা যায়। যে-কোন দেশের মানুষ, যে কিছুটা ধর্ম মানে, সেই বোধ করিয়া থাকে—মানুষ দেহ ও আত্মা দুই-ই। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সাধারণতঃ দেহের দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্যগণ কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার উপর অধিক জোর দিয়া থাকেন, আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় পর্যন্ত এই ভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলে, 'অমুক তাহার আত্মা পরিত্যাগ করিল' (gave up the ghost); ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে লোকে বলিয়া থাকে, 'অমুক দেহত্যাগ করিল'; পাশ্চাত্য ভাব—মানুষ একটা দেহ, তাহার আত্মা আছে; প্রাচ্যভাব—মানুষ আত্মাস্বরূপ, তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে-আদর্শ অনুসারে মানুষ দেহ এবং তাহার একটি আত্মা আছে, সেই আদর্শে দেহের উপরে সম্পূর্ণ ঝোঁকটা পড়িয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা কর—মানুষ কি জন্য জীবনধারণ করে? ঐ আদর্শের অনুগামিগণ বলিবে, 'ইন্দ্রিয়সুখভোগের' জন্য; দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজন-পান করিব, অনেক বিষয়—ধন-দৌলতের অধিকারী হইব; বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সব থাকিবে, তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা কল্পনা করিতে

পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে-সকল ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই চলিতে থাকিবে। ইহলোকে সে চিরকাল এই সুখভোগ করিতে পারিবে না—এজন্য সে বড়ই দুঃখিত, তাহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সে মনে করে, যে-কোন ভাবে হউক সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এ-সবই নূতনভাবে চলিতে থাকিবে। তাহার এই-সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, এই-সব সুখভোগই থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চায়, তাহার কারণ—ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্যলাভের উপায়। তাহার জীবনের লক্ষ্য—বিষয়-সম্ভোগ। সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই-সব সুখ দিতে পারেন, তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই, এই-সব ইন্দ্রিয়সুখভোগের ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাই নয়; যদি ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখভোগ যত অল্প, তাহার জীবন তত উন্নত। কুকুরটা যখন খায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। শূকর-শাবকটার ব্যবহার লক্ষ্য করিও—সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করে! সে যেন স্বর্গসুখ পাইতেছে, যদি কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা আসিয়া তাহার দিকে তাকান, সে তাঁহাকে লক্ষ্যই করিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র জীবন। এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই, যে ঐভাবে খাইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, নিম্নতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ্ণ—তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখেই পশুগণের চরম আনন্দ—তাহারা ঐ আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর যে যত অনুন্নত, ইন্দ্রিয়সুখে সে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে। দেখিবেন, আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রেমের যতই বিকাশ হইবে, ততই আপনাদের ইন্দ্রিয়-সুখসম্ভোগের শক্তি কমিয়া যাইবে।

বিষয়টি আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দেওয়া আছে, সে শক্তি—হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের একটির উপর যে-পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্যগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি তবে ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণতর। আর বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাস হইতে আমরা এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং শরীর দুর্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন, ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায়, বর্বর জাতিই প্রায় সর্বদা জয়লাভ করে। অতএব আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবার বাসনা হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা অসম্ভব কিছু চাহিতেছি—কারণ তাহা হইলে আমরা পশু হইয়া যাইব। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে তার ইন্দ্রিয়সুখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না, সে কি চাহিতেছে; মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়া পশুজন্ম হইলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভব। শূকর কখনও মনে করে না, সে অশুচি বস্তু ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র-সত্তা নিয়োজিত।

মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। তাহারা শূকর-শাবকের ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ পঙ্কে গড়াগড়ি দিতেছে—উহার বাহিরে কি আছে উহা দেখিতে পায় না। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখভোগই চায়, আর উহা না পাইলে তাহারা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। ‘ভক্ত’ শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ কখনও ‘ভক্ত’ হইতে পারে না—তাহারা কখনও প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও ঠিক যে, এই নিম্নতর আদর্শ অনুসরণ করিলে কালে এই ভাব পরিবর্তন হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কিছু আছে, যাহার সম্বন্ধে জানিতাম না; জানিলে জীবনের উপর এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপর প্রবল

আসক্তি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন এক সহপাঠীর সঙ্গে কি একটা খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি হইয়াছিল; তাহার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর ছিল, কাজে-কাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। তখন আমার যে ভাব হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। আমার মনে হইল, তাহার মত দুষ্ট ছেলে জগতে আর জন্মায় নাই, আমি যখন বড় হইব, আমার গায়ে জোর হইবে, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল—সে এত দুষ্ট যে, কোন শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড় হইয়াছি, উভয়ের মধ্যে এখন নিবিড় বন্ধুত্ব। এইরূপে এই সমগ্র জগৎ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—খাওয়া এবং উপাদেয় খাবারই তাহাদের সর্বস্ব, যদি এতটুকু এদিক ওদিক হয়, তবেই সর্বনাশ! তাহারা কেবল ভাল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা—সর্বদা সর্বত্র প্রচুর খাবার আছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটি বেশ ভাল মৃগয়ার স্থান। আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ; কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং যতই উচ্চতর বস্তু দেখিতে পাই, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই-সকলের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া (ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে) এই-সব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমরা যেন সেভাবে এই-সকল ধারণা পরিত্যাগ না করি, তাহাতে ভাবগুলি উড়াইয়া দেওয়া হইল—নষ্ট করিয়া ফেলা হইল; যে নাস্তিক এইরূপে সব উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত; কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চায় না, কারণ তাহার মতে স্বর্গই নাই; আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চান না, কারণ তিনি উহাকে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চান কেবল ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর ব্যতীত জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ংই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাকে দর্শন কর, তাঁহাকে সম্ভোগ কর। ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু আমরা ধারণাই করিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ। প্রেম অপেক্ষা কোন উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেম-শব্দ

দ্বারা সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাসা বুঝায় না—উহাকে ‘প্রেম’ নামে অভিহিত করা ঈশ্বরনিন্দার সমান। আমাদের পুত্রকলত্রাদির প্রতি ভালবাসা জীবজন্তুর ভালবাসার মত। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র ‘প্রেম’-শব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধেই সম্ভব। এই প্রেমলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা পিতামাতা, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য সকলকেই ভালবাসিতেছি—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি। আমরা ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—একটি সোপানে আরোহণ করিয়া উহাতেই আমরা আবদ্ধ হইয়া যাই, আমরা একটি ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ি। কখনও কখনও মানুষ এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। মানুষ এই জগতে চিরকাল স্ত্রী-পুত্র ধন-মান— এই-সবের দিকে ছুটিতেছে, সময়ে সময়ে তাহারা বিশেষ ধাক্কা খাইয়া সংসারের যথার্থ রূপ বুঝিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মানুষ বোঝে, মানুষের ভালবাসা সব শূন্য। মানুষ ভালবাসিতেই পারে না—শুধু কথা বলে। ‘আহা! প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি’ বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়া পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু যেই স্বামীর মৃত্যু হয়, অমনি সন্ধান করে, ব্যাঙ্কে তাঁহার কত টাকা আছে; আর কাল তাহার কি গতি হইবে—এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিত হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে তাহার দিকে আর চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাপূর্ণ।

সান্ত জীব কখনও ভালবাসিতে পারে না, অথবা সান্ত জীব ভালবাসার যোগ্যও হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই যখন ভালবাসার পাত্রের দেহের এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনন্ত প্রেমের কি আর আশা করা যাইতে পারে? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। তবে এ-সব ভালবাসাবাসি কেন? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র—প্রেমের বিভিন্ন অবস্থানমাত্র। মহাশক্তি আমাদের পিছন হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন—আমরা জানি না কোথায় সেই

প্রেমাস্পদকে খুঁজিব, কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। বারংবার আমাদের ভ্রম ধরা পড়িতেছে। আমরা একটা জিনিষ ধরিলাম– উহা আমাদের হাত ফসকাইয়া গেল, তখন আমরা আর কিছুর জন্য হাত বাড়াইলাম। এইভাবে আমরা আগাইয়া চলি, শেষ পর্যন্ত আলোক আসিয়া থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই–একমাত্র তিনিই আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন, তাঁহার ভালবাসার কোন পরিবর্তন নাই, তিনি সর্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমি অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে কেই বা কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য করিবেন? যাহার মনে ক্রোধ ঘৃণা বা ঈর্ষা নাই, যাহার সাম্যভাব কখনও নষ্ট হয় না, যাহার জন্ম নাই–মৃত্যু নাই, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়–অতি অল্প লোকেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে। আমরা শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মের দোকানদারি করে, সকলেই ধর্মের কথা বলে, খুব কম লোকেই প্রকৃত ধর্ম লাভ করিয়া থাকে। এক শতাব্দীর মধ্যে অতি অল্প লোকই সেই ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক সূর্যের উদয়ে সমগ্র অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি এই অল্পসংখ্যক যথার্থ ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত পুরুষের অভ্যুদয়েই সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। এরূপ ঈশ্বর-পুত্রের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ ধন্য হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু আমাদের সকলেরই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে হইব না, তাহা কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসে ; স্ত্রীও ভাবে– আমি স্বামিগতপ্রাণা। কিন্তু যেই একটি সন্তান হইল, অমনি অর্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা সন্তানের প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্বের মত ভালবাসা নাই। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, অধিকতর ভালবাসার পাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে পূর্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন কয়েকজন সহপাঠীকেই আপনারা জীবনের প্রিয়তম বন্ধু মনে

করিতেন অথবা মাতাপিতাকে ঐরূপ ভালবাসিতেন, তারপর বিবাহ হইল, তখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতর হইয়া উঠিল। আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটি বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটি বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল, অবশেষে সূর্য উঠিল—তখন সূর্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল। সূর্যই সেই ঈশ্বর। এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্যের উদয় হয়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়—ঐরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন 'ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত মানব' (a God-intoxicated man) বলিয়াছেন; তখন তাহার নিকট মানুষ জীবজন্তু সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বর-রূপে পরিণত হয়—সবই সেই এক প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রেম কেবল জৈব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের কি প্রয়োজন? কোন মূর্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা ভয়ানক পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর সামনে ঐরূপে নতজানু হওয়া যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই!

এই-সবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। সংসারে আমরা ভালবাসার বহু স্তরের সম্মুখীন হই। প্রথমে আমাদের জমি পরিষ্কার করিতে হইবে। জীবনটাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, ভালবাসার সমগ্র তত্ত্ব তাহারই উপর নির্ভর করিবে। এই সংসারই জীবনের চরম লক্ষ্য—এইরূপে মনে করা পশুজনোচিত ও মানুষের ঘোর অবনতির কারণ। যে এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সে-ই ক্রমে হীন হইয়া যায়; সে আর কখনও উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে না—জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত আভাসও কখনও পাইবে না, সে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সে কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে ভাল ভাল খাবার খাইতে পায়। এরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস—ইন্দ্রিয়ের দাস মানুষ, নিজেকে জাগাও, উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, চক্ষু-কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির দাস হইয়া থাকিবার জন্যই এই মানুষের—এই অনন্ত আত্মার—দেহধারণ? আমাদের পিছনে অনন্ত সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা, আর প্রেমবলেই আপনার ঐ শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের

স্মরণ রাখা উচিত—ইহাই আমাদের আদর্শ। একদিনেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। আমরা কল্পনা করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়—ঐ অবস্থা এখনও বহু বহু দূরে। যে যে-অবস্থায় রহিয়াছে, যদি সম্ভব হয়, সেই অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। মানুষ জড়বাদের উপরই নির্ভরশীল। তুমি আমি সকলেই জড়বাদী। ঈশ্বর সম্বন্ধে—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যা কিছু বলিয়া থাকি, তা বেশ ভাল, কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথা মাত্র; আমরা তোতাপাখির মত সেগুলি শিখিয়াছি এবং মাঝে মাঝে আওড়াইয়া থাকি। অতএব আমরা যে-অবস্থায় আছি অর্থাৎ আমরা এখন যে জড়বাদী—সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মাবাদী বা চৈতন্যবাদী হইব—নিজদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু, তাহা বুঝিব; তখন দেখিব—যে-জগৎকে আমরা অনন্ত বলিয়া থাকি, তাহা অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম জগতের একটি স্থূল বাহ্যরূপ মাত্র।

ইহা ছাড়া আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন আছে। আপনারা বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount)-এ পাঠ করিয়াছেনঃ 'চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিয়া যাইবে; খোঁজ তবেই পাইবে।' মুশকিল এই যে—চায় কে, খোঁজে কে? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশ্বরকে জানি। ঈশ্বর নাই—প্রমাণ করিবার জন্য কেহ এক বৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আর একজন আরও বড় একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন ধরিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজের কর্তব্য মনে করিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করাই নিজ কর্তব্য মনে করেন ও প্রচার করিয়া বেড়ান—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন? ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, অনেকের পক্ষেই তাহাতে কি আসে যায়? এই শহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতরাশ সম্পন্ন করে—ঈশ্বর আসিয়া তাহার পোষাক বা আহারের ব্যাপারে কোন সাহায্য করেন না। তারপর তাহারা কাজে যায় ও

সারাদিন কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহারা বাড়ি আসে, তারপর উত্তমরূপে ভোজন করিয়া শয়ন করে—এ-সব কাজই তাহারা যন্ত্রবৎ করিয়া থাকে, ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করে না, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। মানুষের চারিটি নিত্যকর্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া বলে, 'সময় হইয়াছে—চল।' তখন মানুষ বলিয়া থাকে—'মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আর একটু সময় চাই, আমার ছেলেটি একটু বড় হোক।' কিন্তু মৃত্যু বলে—'এখনই চল, তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।' জগৎ এইরূপেই চলিয়াছে। এইরূপেই সাধারণ মানুষের জীবন কাটিয়া যায়। সে বেচারাকে আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই। হয়তো পূর্বজন্মে সে একটি শূকরছানা ছিল—মানুষ হইয়া তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর ঐরূপ নয়—কতক লোক আছেন, যাঁহাদের কিছুটা চৈতন্য হইয়াছে। হয়তো কিছু দুঃখকষ্ট আসিল—যাহাকে আমরা খুব ভালবাসি, সে মরিয়া গেল। যাহার উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম—যাহার জন্য সমুদয় জগৎকে, এমন কি নিজের ভাইকে পর্যন্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, যাহার জন্য ভয়ানক কার্য করিয়াছি, সে মরিয়া গেল, তখন হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল, হয়তো অন্তরাত্মার বাণী শোনা গেল—'তারপর কি?' যে ছেলের জন্য মানুষ সকলকে প্রতারণা করিল, নিজেও কখনও ভাল করিয়া খাইল না, সে হয়তো মারা গেল—সেই আঘাতে মানুষ জাগিয়া উঠে। যে-স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য মানুষ উন্মত্ত বৃষের মত সকলের সহিত লড়াই করিয়াছিল, যাহার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাকা জমাইতেছিল, সেই স্ত্রী একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল, তারপর? কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মৃত্যুতে কোন আঘাত বোধ হয় না; কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই যখন কোন জিনিষ হাত ফসকাইয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—এর পর কি? ইন্দ্রিয়ের প্রতি আমাদের এমনই দারুণ আসক্তি! ইহারই জন্য আমরা কষ্ট পাই। আপনারা শুনিয়াছেন—জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সে একটা খড়ের কুটা ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরূপ সামনে যাহা পায় তাহাই ধরিয়া থাকে; আর যখন ব্যর্থ হয়, তখনই বলিয়া থাকে—

কে আছ, আমায় রক্ষা কর, সাহায্য কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে মানুষকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এই ভক্তিযোগ কিন্তু একটি ধর্ম-সাধনা। আর ইহা বহুর জন্য নয়; তাহা হওয়াই অসম্ভব। নতজানু হওয়া, ওঠ-বস-করা—এ-সব কসরৎ সর্বসাধারণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম অতি অল্প লোকের জন্য। সকল দেশেই হয়তো মাত্র কয়েক শত লোক যথার্থ ধার্মিক হইতে পারে বা হইবে। অপরে ধর্ম করিতে পারে না, কারণ তাহারা জাগরিত হইবে না—তাহারা ধর্ম চায়ই না। প্রধান কথা হইতেছে— ভগবানকে চাওয়া। আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সবকিছুই চাই; কারণ আমাদের সাধারণ অভাবগুলি বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া যায়। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ হয় না তখনই আমরা অন্তর্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে আমাদের অভাব পূরণ করিতে চাই। যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন আমাদের থাকিতে পারে না। কেবল যখন আমরা এখানকার বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত, এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাই, তখনই আমরা ঐ অভাবপূরণের জন্য ইন্দ্রিয়জগতের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই উহা মিটাইবার তাগিদ হয়। যত শীঘ্র পার, এই সংসারের ছেলেখেলা শেষ করিয়া ফেলো, তবেই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবে, তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে।

এক-রকম ধর্ম আছে—উহা ফ্যাশন বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়তো যথেষ্ট আসবাব আছে; এখানকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (□□□□) রাখা, অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও ঐ পাত্র একটি অবশ্যই চাই। এইরূপ অল্পস্বল্প ধর্মও চাই—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নয়। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। তাহাকেই বলে ব্যাকুলতা, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। বায়ু চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই; এগুলি ব্যতীত আমরা জীবনধারণ করিতে পারি না। মানুষ যখন কোন নারীকে ভালবাসে, তখন সময় সময় সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে

ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারে না, যদিও ইহা তাহার ভ্রম। স্বামী মরিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী মনে করে—স্বামীকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু দেখা যায়—সে তো ঠিক বাঁচিয়াই থাকে। আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আর বাঁচিব না, কিন্তু তবু তো ঠিক বাঁচিয়া আছি; প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য—যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানের ঐরূপ অভাব বোধ করিব, অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, যখন আমরা এই জগতের—সমুদয় জড়শক্তির অতীত কিছুর জন্য অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞানমেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্বাতীত সত্তার একবার মাত্র চকিত দর্শন লাভ করি, সেই মুহূর্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় বোধ হয়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মূল্য কতটুকু? তখনই আত্মার বিকাশ হয়, ভগবানের অভাব অনুভূত হয়; তখন এমন বোধ হয় যে, তাঁহাকে পাইতেই হইবে।

সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই জিজ্ঞাসা—আমরা কি চাই? প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই? আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি, উচ্চতম মেধা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন।৮ ভালবাসা সর্বদাই পারস্পরিক, প্রতিবিম্বের মত; আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন এবং আমি আপনাকে ভালবাসিতে গেলে আপনি আমাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তবু যদি আমি আপনাকে ভালবাসিতে যাই, তবে এক মাসে হউক, এক বৎসরে হউক, আপনি আমাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইবেন। মনোজগতে ইহা একটি সর্বজনবিদিত ঘটনা। ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবানকে ভালবাসে, সে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে। প্রেমিকা স্ত্রী যেভাবে তাহার মৃত পতির চিন্তা করে, পুত্রগণকে আমরা যেভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেইভাবে আমাদিগকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করিব। এই-সব

বই, এই-সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। বই পড়িয়া আমরা তোতাপাখি হই, বই পড়িয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রেমের একটি অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত। অতএব প্রথমেই আমাদের চাই—সেই আকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুলতা।

প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ভগবানকে চাই? যখন আমরা ধর্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করি, বিশেষতঃ যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন নিজ নিজ মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। অনেক সময় দেখি, আমি তো ভগবানকে চাই না, বরং তদপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যই ভালবাসি। এক টুকরো রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি; অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা একটা হীরার পিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন! ভগবানের জন্য তাঁহাদের সে ব্যাকুলতা নাই। এই বিশ্বজগতে যিনি একমাত্র সত্য বস্তু, তাঁহাকে তাঁহারা জানেন না। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে—'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।' গরীবের খড় লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে? অতএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবানকেই ভালবাসুন। সংসারের এ-সব জিনিষ ভালবাসিয়া কি হইবে? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—তবে আমার উদ্দেশ্য ভাল; আমি সত্য কথা বলিতে চাই, আমি আপনাদের তোষামোদ করিতে চাই না, ঐরূপ করা আমার কাজ নয়। ঐরূপ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি শহরের ভাল জায়গায় শৌখিন লোকের উপযোগী একটা চার্চ খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানের মত—আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে চাইঃ এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই এই সত্য লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসারের বাহিরে যাওয়ার আর অন্য উপায় নাই। তিনি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জগৎই জীবনের চরম লক্ষ্য—এরূপ ধারণাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জগতের—এই দেহের একটা নিজস্ব মূল্য আছে, এবং উহা গৌণ। এগুলি উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে সংসারসুখ-লাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, লোকে উপাসনা-স্থলে গিয়া প্রার্থনা করিতেছে—ভগবান্, আমার

রোগ সারাইয়া দাও; ভগবান্, আমায় ইহা দাও, উহা দাও। তাহার সুন্দর সুস্থ দেহ চায়–যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন কেহ কোন স্থানে বসিয়া আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্মের এরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিকতা ভাল। আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনা করিয়াও আমরা এই আদর্শে উপনীত হইতে পারিব কিনা জানি না, কিন্তু এটিকেই সর্বোচ্চ আদর্শ করিতে হইবে–আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকেও উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছানো না যায়, অন্ততঃ কিছুদূর পর্যন্ত তো যাওয়া যাইবে। ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হইবে।

৩. ভক্তির আচার্য-সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ

সকল আত্মাই বিধাতার নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা লাভ করিবে। অতীতে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহারই ফলস্বরূপ, আর এখন যেরূপ কার্য বা চিন্তা করিতেছি তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্মবাদ সত্য হইলেও ইহার মর্ম এই নয় যে, আত্মোন্নতি-সাধনে অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মা হইতে শক্তিসঞ্চার দ্বারাই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ বাহিরের সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। বাহির হইতে প্রেরণা শক্তি আসিয়া যখন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর কার্য করিতে থাকে, তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়—মানুষের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানুষ পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।

বাহির হইতে যে-শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কিছু হইতে নয়। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি, খুব বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিব—আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধি খুব উন্নত ও বিকশিত হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই; বরং আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ

করিতে করিতে কখনও কখনও ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব–উহাতে আমাদের বুদ্ধিই কিছুটা সাহায্য পাইয়াছে মাত্র, আত্মার কিছুই হয় নাই। এই জন্যই আমরা প্রায় সকলেই ধর্মসম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, অথচ ধর্মানুযায়ী জীবন-যাপনের সময় অনুভব করি–আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা। ইহার কারণ–আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্য বাহির হইতে যে শক্তির প্রয়োজন, পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে, এবং যাহাতে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে 'শিষ্য' বলে। এই শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যাঁহার নিকট হইতে শক্তি আসিবে, তাঁহার সঞ্চার করিবার মত শক্তি থাকা আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহারও উহা গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সজীব হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্রও সুকৃষ্ট হওয়া চাই; এবং যেখানে এই দুইটি শর্ত পূর্ণ হইয়াছে, সেখানেই ধর্মের অপূর্ব বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'–ধর্মের বক্তাও অলৌকিক-গুণসম্পন্ন, আর শ্রোতাও তদ্রূপ।৯ আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক-গুণসম্পন্ন এবং অসাধারণ-প্রকৃতির হন, তখনই চমৎকার আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যায়, নতুবা নয়। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ গুরু এবং ঐরূপ ব্যক্তিই যথার্থ শিষ্য–অপরে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে একটু জানিবার চেষ্টা–একটু সামান্য কৌতূহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মের বহিঃসীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই-সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যথার্থ ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইতে পারে। আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্যময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ আসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্মের প্রয়োজন হইবে, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক গুরুও অবশ্যই আসিবেন। কথায় বলে–'যে পাপী পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।' গ্রহীতা আত্মার

আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ব হয়, তখন উহা যে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভালবাসি; সে মরিয়া গেল, মুহূর্তের জন্য আঘাত পাইলাম। বোধ হইল—সমুদয় জগৎটা জলের মত আঙুল দিয়া গলিয়া যাইতেছে। তখন আমরা ভাবি, এই অনিত্য সংসার হইতে উচ্চতর বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে; আর মনে করি—আমরা ধার্মিক হইতেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মন হইতে সেই ভাব-তরঙ্গ চলিয়া গেল; আমরা যেখানেই ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভুল করি। কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিনই সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনবোধ আসিবে না এবং আমরা শক্তিসঞ্চারকের সাক্ষাৎ লাভও করিতে পারিব না।

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না, তখন ঐরূপ বিরক্তিপ্রকাশের পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা, আমরা যথার্থই সত্যবস্তু চাই কিনা। তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিব—আমরাই ধর্মলাভের উপযুক্ত নই, আমরা উহা চাই না; অধ্যাত্মতত্ত্বলাভের জন্য এখনও আমাদের পিপাসা জাগে নাই। শক্তিসঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অনেক বাধাবিঘ্ন।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তথাপি অহঙ্কারবশতঃ নিজেদের সবজান্তা মনে করে, আর শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে 'অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় গিয়া পড়ে'।১০ পৃথিবী এইরূপ মানুষেই পূর্ণ; সকলেই গুরু হইতে চায়। এ যেন ভিখারীর লক্ষমুদ্রাদানের প্রস্তাবের ন্যায়। এই ভিক্ষুক যেমন হাস্যাস্পদ হয়, ঐ গুরুরাও তেমনি।

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে? প্রথমতঃ সূর্যকে দেখিবার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না–বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে, সূর্য উঠিয়াছে, আমাদের কল্যাণার্থে যখন কোন লোকগুরুর আবির্ভাব হয়, তখন আত্মা স্বভাবতই বুঝিতে পারে, সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। সত্য স্বতঃসিদ্ধ–উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না–উহা স্বপ্রকাশ, উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশে পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

অবশ্য এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরাও সকলে এতটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নই যে, আমরা যাঁহার নিকট শক্তি- লাভের জন্য যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব–সেইজন্য কতকগুলি পরীক্ষা প্রয়োজন। শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে।

শিষ্যের থাকা চাই–পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। পবিত্রতাই শিষ্যের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। সর্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন–যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। ধর্ম চায় কে? এই তো প্রশ্ন। সনাতন বিধানই এই, আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। যে চায়–সে পায়। ধর্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ; আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। তারপর আমরা তো সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্মের কথা শুনিলেই বা ধর্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয় না; যতদিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা–নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম। এ দু-এক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়, হয়তো প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম লাভ হইতে পারে, অথবা শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে, তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্মসাধনে অগ্রসর, সেই কৃতকার্য হয়।

গুরু সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরান ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি তো কেবল শব্দরাশি, বাহ্য পদ্ধতি, ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব—ধর্মের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। ধর্মাচার্য হয়তো গ্রন্থবিশেষের রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু শব্দ তো ভাবের বাহ্য আকৃতি বৈ আর কিছুই নয়। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, এবং মনকে সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্যস্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ, মন ঐ শব্দজালের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।১১ বিভিন্ন প্রকারের শব্দযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা, কথা বলিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্র বাখ্যা করিবার নানা উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে কখনও মুক্তিলাভ হয় না।১২ তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক—যাহাতে সকলে তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন, জগতে কোন শ্রেষ্ঠ আচার্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকার্থ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টাও করেন নাই, তাঁহারা বলেন নাই, এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দ এবং ঐ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবন ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন্ ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কিরূপে ঘুমাইত—এই সম্বন্ধে তিনখণ্ড এক গ্রন্থ লিখিলেন।

আমাদের গুরুদেব একটি গল্প বলিতেনঃ কয়েকজন লোক আমবাগানে গিয়াছিল; তাদের মধ্যে অধিকাংশই গনিতে লাগিল—কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, পাতার কি রঙ, ডালগুলি কত বড়, কত শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি। এ-সব লিখিয়া লইয়া নানারকম আশ্চর্য আলোচনা করিতে লাগিল। আর একজন—সেই বেশী

বুদ্ধিমান্‌—বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল। অতএব এই ডালপালা ও পাতা গোনা ছাড়িয়া দাও। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ-সব কর্মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে—এই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। ঐরূপ কার্যের দ্বারা কেহ কখনও আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। এই-সব 'পাতাগোনা' দলের ভিতর কি আপনারা কখনও একজনও ধর্মবীরকে দেখিয়াছেন? ধর্মই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব; উহা আবার সর্বাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাতাগোনা বা হিসাব করার মত ঝামেলার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হয়—বেথলিহেমে বা জেরুজালেমে, তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন্‌ তারিখে 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন, এ-সব জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশগুলি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দুই হাজার শব্দের একটি প্রবন্ধ পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ-সব পণ্ডিতদের আমোদের জন্য—তাঁহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া আসুন—আমরা 'আম খাই'।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন তাহা লইয়া কাজ করিলেই হইল।' এ-কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রেরই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা কেবল বুদ্ধিবিষয়ক বলিয়া বুদ্ধিজাত শক্তির উপর নির্ভর করে; এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার কিছুমাত্র বিকাশ না থাকিলেও একজনের দারুণ-বুদ্ধিশক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানে—যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, তাহার হৃদয়ে কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক আলোক প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। সে কি শিক্ষা দিবে? সে তো নিজেই কিছু জানে না। চিত্তের শুদ্ধিই আধ্যাত্মিক সত্য। 'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন'— এই একটি বাক্যের

মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটি কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু কথিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে-সবই আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা ঐ একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন বা সেই সর্বাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শন অসম্ভব। অতএব গুরুর 'পবিত্রতা'রূপ এই একটি গুণ থাকিতেই হইবে, প্রথমে দেখিতে হইবে—তিনি কি প্রকারের মানুষ; তারপর শুনিতে হইবে, তিনি কি বলেন। লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে অবশ্য এ-কথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক, ইহা জানা অপেক্ষা তাঁহারা কি বলেন, এইটি জানা আমাদের বেশী প্রয়োজন। ধর্মাচার্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে, তিনি কিরূপ চরিত্রের মানুষ, তবেই তাঁহার কথার একটা মূল্য হইবে; তিনি যে শক্তিসঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কী সঞ্চার করিবেন? গুরুর মনে এক প্রকার স্পন্দন রহিয়াছে, শিষ্যের মনে তিনি উহা সঞ্চার করিয়া দেন। একটি উপমা দেওয়া যাক। যদি এই আধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুবা পারে না। ইহা একজন হইতে আর একজনের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের কথা—কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নয়। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজরূপে আসিয়া ক্রমশঃ বৃহৎ বৃক্ষাকারে বর্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে—গুরুর উদ্দেশ্য কি। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন; কেবল ভালবাসা—শিষ্যের প্রতি অকপট ভালবাসার জন্যই যেন তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে। অপর কোন মাধ্যমের দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোন প্রকার লাভ বা নামযশের আকাঙ্ক্ষারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মাধ্যম নষ্ট হইয়া

যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সব কিছু করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

যখন দেখিবে–গুরুর এই গুণগুলি আছে, তখন আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে সময় সময় কুভাব সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব স্বভাবতই বোধ হইতেছে, যে- কোন ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পার না। নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ১৩ অলঙ্কার-হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাও প্রচার করিতে পারে না। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে?–প্রকৃত গুরুর জ্ঞানালোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে; হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী-প্রস্তর চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে–ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও প্রস্তরই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা; আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন-উন্মীলনকারী। অতএব পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ এবং শিষ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান বা উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে কথা বলা বেশ ভাল বটে, কিন্তু নম্রতা বিনয় আজ্ঞাবহতা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ এখনও বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত হয়, কিন্তু যে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসর্জিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম চিত্তবিনোদনের একটি উপায়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। যে-সকল জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর, গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরুশিষ্যের ভিতর ঐরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই পারে না। প্রথমতঃ শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই; দ্বিতীয়তঃ যাহার ভিতরে সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই–কারণ

সকলেই যে স্বাধীন! কাহার নিকট হইতে তাহারা শিখিবে? আর কেহ শিখিতে আসিলেও সে জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে—বলেঃ আমাকে এক টাকার ধর্ম দাও। আমরা কি আর এজন্য এক টাকা খরচ করিতে পারি না?—এভাবে ধর্মলাভ করা যায় না।

জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই১৪; গুরুর মাধ্যমে উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। সিদ্ধ যোগী হইলে ঐ জ্ঞান আপনা-আপনি আসিয়া থাকে, গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না! যতদিন না গুরুলাভ করিতেছ, ততদিন পৃথিবীর চার কোণে মাথা খুঁড়িয়া আসিতে পার, অথবা হিমালয়, আল্পস্ বা ককেসস্ পর্বত অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতে বা সাগরের তলদেশেও যাইতে পার, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরু লাভ কর; সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর। গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে, তারপর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার বাহ্যরূপ আর দেখা যায় না, তখন সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বিরাজমান। যাঁহারা এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব লইয়া সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হন, সত্যের ভগবান্ তাঁহাদের নিকট অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। ‘পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।’১৫ যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, সেই স্থানই পবিত্র! যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর পবিত্র! আর যাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কত গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমীপে যাওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ গুরু একটিও থাকেন না—এমন কখনও হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরু-বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তেই উহা ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনের সুন্দরতম বিকাশ—তাঁহারা আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। তাঁহাদের শক্তিতেই সমাজ-বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—এই পৃথিবীর খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা গুরুরও গুরু—স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ। তাঁহারা পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি শুধু ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে সাধুতে পরিণত হয়। তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই? আমি যে-সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম, এই গুরুগণ তাঁহাদের মত নন, ইঁহারা ঐ-সকল গুরুরও গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপে আমরা ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, একমাত্র তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

অবতারের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবে ব্যতীত অন্যরূপে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে তাঁহার এক ভয়ানক বিকৃত রূপই গড়িয়া থাকি। ভারতের চলিত কথায় বলে, এক মূর্খ শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি বানর গড়িয়াছিল। যখনই ঈশ্বরের মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করি, তখনই আমরা তাঁহাকে বিকৃত করিয়া তুলি, কারণ যতক্ষণ আমরা মানব, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানব অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলো না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্যরূপে দেখিতে পাইবে না। আমরা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তিতা দিতে পারি, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারি, প্রমাণ করিত পারি যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই-সকল পৌরাণিক গল্প একেবারে অর্থহীন, কিন্তু একবার সহজ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক—ঐ অসাধারণ বুদ্ধির পশ্চাতে কি আছে? উহা শূন্য, খানিকটা বুদ্বুদ মাত্র। অতঃপর যখনই দেখিবে, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বর-পূজার বিরুদ্ধে খুব জোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করঃ ঈশ্বর-সম্বন্ধে আপনার কী অনুভূতি? ‘ সর্বশক্তিমত্তা’, ‘সর্বব্যাপিতা’, ‘সর্বব্যাপী প্রেম’ ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐগুলির বানান ছাড়া আর বেশী কি বোঝেন? সে কিছুই

বোঝে না, সে ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ভাবই বোঝে না। রাস্তার যে লোকটি একখানি বইও পড়ে নাই, তাহা অপেক্ষা সে কোন অংশে উন্নত নয়। তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি—সে সংসারের শান্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত। তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মানুভূতি নাই, উভয়ে এক ভূমিতেই অবস্থিত।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম; শুধু কথা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করিতে হইবে। আত্মাতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে কি বোঝায়? মানুষের তো নিরাকার আত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই—তাহার সম্মুখে যে-সব আকৃতিমান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সমুদ্র বা একটা বিরাট কিছুর চিন্তা করিতে হয়। তা-ছাড়া সে আর কিরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিবে? তুমিই বা কি করিতেছ? তুমি সর্বব্যাপিতার কথা বলিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এই-সব বৃথা তর্কযুক্তি কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হউক—আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মত দুর্লভ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। এ পৃথিবীতে বড় বেশী কথা ও আলোচনা!

আমাদের বর্তমান গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আমরা সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানকে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহদাকার মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এক বৃহৎ মৎস্যরূপেই ভগবানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষ যদি ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে চায়, তবে তাহাকে মানুষরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে, আর এগুলি শূন্য কল্পনা নয়। তুমি, আমি, মহিষ, মৎস্য—ইহাদের প্রত্যেকে যেন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গেল; মানবরূপ পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষপাত্রে মহিষাকার ও মৎস্যপাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেকটি পাত্রে জল ছাড়া আর কিছুই নাই। যে

ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। ঈশ্বরকে—মানুষ মানুষরূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দেখে। যে যার নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। কেবল এইভাবেই তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে মানুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনাই করিতে হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর পথ নাই।

দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে মানুষভাবে উপাসনা করে না, পশুপ্রকৃতির মানব—যাহার কোন ধর্মই নাই, আর পরমহংস—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি মানবভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ-মনের বোধ দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই, শরীরবোধও নাই—তিনিই যীশু ও বুদ্ধের মত ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপেই উপাসনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করেন না। আর অপর প্রান্তে পশুভাবাপন্ন মানব। আপনারা জানেন, দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে না, মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে উপাসনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ততটা তাহাদের হয় নাই; জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন; তাঁহারাও উপাসনা করেন না। তাঁহারা আর কাহার উপাসনা করিবেন? ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের পূজা করিবে না, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। সে যে কী বলিতেছে, তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না; সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম অসার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। আর যে-সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য। খ্রীষ্টানদের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব তাঁহারা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখুন—তাঁহারা যেন কখনই খ্রীষ্টকে না ছাড়েন। ভগবদ্দর্শনের স্বাভাবিক উপায়—মানুষে ঈশ্বরদর্শন। আমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই এরূপ দেব-মানবে বর্তমান। খ্রীষ্টানদের এটি বিশেষ ত্রুটি যে,

তাঁহারা খ্রীষ্ট ব্যতীত ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না। খ্রীষ্ট ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধও তাই ছিলেন, এরূপ আরও শত শত হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও 'ইতি' করিবেন না, ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা উচিত মনে করেন, খ্রীষ্টকেও তাহা নিবেদন করুন। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। খ্রীষ্টানরা যে প্রার্থনা করিবার সময় 'খ্রীষ্টের নামে' বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভাল; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করার প্রথা প্রচলিত হইলে আরও ভাল। ঈশ্বর মানবের দুর্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করেন। 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি।' ১৬

'জগতের সর্বশক্তিমান্ বা সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে ভগবান্ আবার কিরূপে মানব-রূপ ধরিবেন।'১৭ তাহাদের মন আসুরিক, অজ্ঞানমেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান্ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং তাঁহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সেইভাবে উপাসনা করিব। তাঁহার জন্মদিনে আমি ভোজের আনন্দ না করিয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সদৃশ করিয়া লন। আমাদের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, তাঁহাদের মত হইয়া যায়।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যে বিচরণকারী ভূত-প্রেতাদির সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি অন্যায়! খ্রীষ্ট ভূত-প্রেত-নামানোর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি

এই দেশে (আমেরিকায়) এ-সব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের অবতারগণ এইভাবে আসেন না, তাঁহাদের স্পর্শের ফল মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকটিত হইবে। খ্রীষ্টের স্পর্শে মানুষের সমগ্র আত্মাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টভাবেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিচ্ছুরিত হইবে। রোগ-আরোগ্যকরণে বা অন্যান্য অলৌকিক কার্যে খ্রীষ্টের কতটুকু শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি নিম্নাধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়া ঐ ছোটখাটো বিস্ময়ের কার্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সকল অদ্ভুত কার্য কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?—য়াহুদীদের মধ্যে; আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথাও ঐগুলি অনুষ্ঠিত হয় নাই?—ইওরোপে! ঐ-সব অদ্ভুত কার্য য়াহুদীদের ভিতর অনুষ্ঠিত হইল—আর তাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল। এবং তাঁহার 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) ইওরোপে প্রচারিত হইল, সেখানে উহা গৃহীত হইল। মানুষ চিন্তাশীল—যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য করায় বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্যে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব নয়—একটা মহা মূর্খও ঐ-সব করিতে পারে। তাহারাও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে, পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরের রোগ সারাইতে পারে। আমি দেখিয়াছি—অতি ভয়ানক অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য করিয়াছে, তাহারা মাটি হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি অনেক মূর্খ ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক মূর্খ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভয়ানক রোগ সারাইয়া দিয়াছে। এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। খ্রীষ্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক; তাঁহার সর্বশক্তিমান্ বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাদিগকে নীরোগ করিতেন—এ-কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন, 'পবিত্রাত্মারা ধন্য'—এ-কথা মানুষ ভুলিতে পারে না, এ-কথা আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন মানুষের মন থাকিবে, ততদিন ঐ বাক্যগুলি অফুরন্ত মহাশক্তির ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে। যতদিন মানুষ ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায়, ততদিন ঐ বাক্যগুলি থাকিবে—

ঐগুলির শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে, কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তিলাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, এই শক্তি তাঁহার ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর বাস্তবিকই ইহা যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কি চাহিতেছি। অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনের হাস্যকর ব্যাপার নয়, আত্মার অদ্ভুত শক্তি আমাদের চাহিতে হইবে—যাহা মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক দূর করে এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।

৪. প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা

ভক্তি দুই প্রকার—প্রথমটি বৈধী বা আনুষ্ঠানিক ভক্তি, অপরটি মুখ্যা বা পরা ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দে অতি নিম্নতম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যন্ত বুঝায়। পৃথিবীতে যে-কোন দেশে বা যে-কোন ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় সকলের মূলে ভালবাসা। অবশ্য ধর্মের ভিতর অনেকটাই কেবল অনুষ্ঠান; আবার অনেক কিছু আছে, সেগুলি অনুষ্ঠানও নয়, ভালবাসাও নয়—তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। যাহা হউক, ঐ অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে সাহায্য করিবার জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক। মানুষ এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—মনে করে, একেবারে লাফাইয়া সে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। শিশু যদি মনে করে, সে একদিনেই বড় হইয়া যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আমি আশা করি, আপনারা সর্বদাই এই ভাবটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? কেহ বা বলিয়া থাকে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ঈশ্বর দেখিয়াছে কিনা? সে যদি বলে, 'দেখিয়াছি'—আপনারা হাসিয়া উঠিবেন ও তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের কাছেই ধর্ম একটা বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র—শুধু কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া। ইহার বেশী তাহারা আর উঠিতে পারে না। আমি আমার জীবনে কখনও এরূপ ধর্ম প্রচার করি নাই, এবং উহাকে আমি ধর্ম নামই দিতে পারি না। ঐ প্রকার ধর্ম স্বীকার করা অপেক্ষা বরং নাস্তিক হওয়া ভাল। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম নির্ভর করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আত্মাকে কখনও দেখিয়াছেন কি? আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, অথচ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না—ইহা কেমন কথা? আপনাদিগকে

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং আত্মদর্শনের কোন উপায় বাহির করিতে হইবে। নতুবা ধর্মসম্বন্ধে কথা বলা বৃথা। যদি কোন ধর্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশ্বর ও সত্য দর্শন করাইতে সমর্থ করিবে। এই-সব মতামত বা বিশ্বাসের কোন একটি লইয়া যদি আপনি ও আমি অনন্তকাল তর্ক করি, তথাপি আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। মানুষ তো যুগযুগান্ত ধরিয়া এরূপ তর্কযুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? বুদ্ধি তো সেখানে মোটেই পৌঁছিতে পারে না। আমাদিগকে বুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিই ধর্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি এক জায়গায় বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে থাকেন, তথাপি কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখনই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি পৃথিবীর সব লোক আপনাকে বলে—ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের কথা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ আপনি জানেন যে, আপনার নিজের চক্ষুর সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশি অপেক্ষা বেশী।

আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও অস্তিত্ব নাই। এরূপ কথা যাহারা বলে, আপনারা তাহাদের কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর অপেক্ষা বলবান্। ধার্মিক হইতে গেলে আপনাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থ ফেলিয়া দিতে হইবে। বই যত কম পড়েন, ততই ভাল।

এক-একবারে একটা করিয়া কাজ করুন। বর্তমানকালে পাশ্চাত্যে অনেকের একটা ঝোঁক দেখা যায়—তাহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব লইয়া খিচুড়ি পাকাইতেছে, সর্বপ্রকার ভাবের বদহজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বন্ধ গোলমাল সৃষ্টি করে; সেগুলি যে স্থির হইয়া একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও সুযোগ পায়

না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানবিধ ভাবগ্রহণ একপ্রকার রোগ হইয়া দাঁড়ায়–কিন্তু ইহাকে আদৌ ধর্ম বলিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন, কিংবা উত্তরমেরু বা অন্য কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্য কোন অদ্ভুত আকারধারী মানুষের কথা বলুন, যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছম করিয়া উঠে। এই-সব বলিলেই তাহারা খুশী হইয়া বাড়ি যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন উত্তেজনা খুঁজিবে। কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাতুলালয়-গমনের পথ–ধর্মলাভের নয়। এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিতে থাকিলে এই দেশ একটা বিরাট বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, আর এই-সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। অতএব ও-সব দিকেই যাইবেন না। ওগুলি কেবল মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়, মস্তিষ্কে তালগোল পাকাইয়া দেয়, মনকে দুর্বল করিয়া অন্তরাত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করে; ফলে মানুষ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম–মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপে বিদ্যা অর্জন করা নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া। 'চুরি করিও না'–এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে ব্যক্তি চুরি করে না, সেই ইহার তত্ত্ব জানিয়াছে। 'অপরকে হিংসা করিও না'–এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহার মূল্য কি? যাহারা হিংসা করে না, তাহারাই অহিংসাতত্ত্ব জানিয়াছে, এবং ঐ আদর্শের উপর নিজদের চরিত্র গঠন করিয়াছে।

অতএব আমাদিগকে ধর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, আর এই ধর্ম উপলব্ধি করা একটি সুদীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। জগতের প্রত্যেক পুরুষই মনে করে–তাহার মত সুন্দর, তাহার মত বিদ্বান্, তাহার মত শক্তিমান্, তাহার মত অদ্ভুত আর কেহ নাই। প্রত্যেক নারীও তেমনি নিজেকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মনে করে। আমি তো এমন

একটি শিশুও দেখি নাই, যে অসাধারণ নয়। সকল জননীই আমাকে বলিয়া থাকেন, 'আমার ছেলেটি কি অসাধারণ!' মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। মানুষ যখন কোন অতি উচ্চ অনুভূতি বা অদ্ভুত বিষয়ের কথা শোনে, তখন মনে করে, অনায়াসেই উহা লাভ করিবে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও স্থির হইয়া ভাবে না যে, অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। সকলে এক লাফে সেখানে উঠিতে চায়। উহা সর্বাপেক্ষা ভাল, অতএব উহা আমাদের চাই-ই। আমরা কখনও স্থির হইয়া চিন্তা করি না যে, উহা লাভ করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা, ফলে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠাইতে পারেন না—আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। অতএব ধর্মের প্রথম সোপান এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নস্তরের উপাসনা।

নিম্নস্তরের উপাসনা কি কি? এই উপাসনা কি ও কতপ্রকার তাহা বুঝাইবার পূর্বে আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বোঝেন? একবার চোখ বুঝিয়া ভাবুন—সর্বব্যাপিতা কি প্রকার! চোখ বুজিয়া আপনি কি দেখেন? হয় সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা, অথবা একটি বিস্তৃত প্রান্তরের কথা বা নিজেদের জীবনে অন্য যে-সব জিনিষ দেখিয়াছেন, সেগুলির কথাই আপনি চিন্তা করেন। যদি তাই হয়, তবে 'সর্বব্যাপী ভগবান্'—এই কথা বলিয়া আপনি কোন ভাবই ব্যক্ত করেন না। আপানার নিকট ঐ বাক্যের কোন অর্থ নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধেও এইরূপ। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধেই বা আমাদের কি ধারণা?—কিছুই নয়। ধর্ম অর্থে উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি; আর যখন আপনি ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তার পূর্বে ঐ শব্দের বানানটুকুই আপনি জানেন, আর কিছুই জানেন না। অতএব শিশুরা যেমন প্রথমে স্থূল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয়, সেইরূপ উচ্চতম অনুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও প্রথমে স্থূল অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। 'পাঁচ দুগুণে দশ' বলিলে একটি ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না, কিন্তু যদি পাঁচটি করিয়া জিনিষ দুইবার লইয়া দেখানো যায়—মোট দশটি জিনিষ হইয়াছে, তাহা হইলে সে বুঝিবে। এই

সূক্ষ্মের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল লাভ হইয়া থাকে। এখানে আমরা সকলেই শিশুতুল্য; বয়সে বড় হইতে পারি এবং জগতের সব বই পড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ধর্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা নৈতিক মতবাদ লইয়া মস্তিষ্ক যতই পূর্ণ কর না কেন, তাহাতে ধর্ম জীবনে বড় কিছু আসে যায় না; নিজে কি হইলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটির উপর ধর্মজীবন নির্ভর করে। আমরা মতামত ও শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে কিছুই উপলব্ধি করি নাই। আমাদিগকে এখন নতূন করিয়া আবার স্থূল বস্তুর মাধ্যমে সাধন আরম্ভ করিতে হইবে–আমাদিগকে মন্ত্র, স্তবস্তুতি, অনুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে; এবং এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার উপাসনা-প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক লোক মূর্তিপূজায় উপকৃত হইতে পারে, কতক লোক নাও হইতে পারে। কতক লোকের ক্ষেত্রে মূর্তির বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইতে পারে, কাহারও বা শুধু মনের মধ্যেই ঐরূপ মূর্তি-চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্তির উপাসনা করে, সে বলে, 'আমি মূর্তিপূজক অপেক্ষা উন্নত; মূর্তিচিন্তা যখন অন্তরে করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক উপাসনা হয়। বাহিরে মূর্তিপূজা করাই পৌত্তলিকতা, এরূপ ধর্মের বিরোধিতা করিব।' যখন কেহ মন্দির বা গির্জারূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করে, সে উহাকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু মূর্তিটি মনুষ্যাকৃতি হইলেই সে উহা অতি ভয়াবহ মনে করে। অতএব স্থূলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার নানাবিধ সাধন প্রণালী আছে, এইগুলির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিব। আবার একই প্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্য নয়। এক প্রকার সাধনপ্রণালী হয়তো আপনার পক্ষে উপযোগী, অন্য আর জনের পক্ষে হয়তো অন্য প্রকার সাধনপ্রণালী প্রয়োজন। প্রত্যেকটি সাধনপ্রণালী যদিও চরমে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সবগুলি সকলের উপযোগী নয়। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটি ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নয়, তবে আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিব? আমার মন্দির-নির্মাণপ্রণালী বা স্তব পাঠ করার রীতি আপনার ঠিক ভাল লাগে না, তবে আমি কেন জোর

করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইতে যাইব? পৃথিবী ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন—বহু নির্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালীগুলি শয়তানি, এবং জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই-সকল সাধনপ্রণালীর সবগুলিই ভাল এবং ধর্মলাভে আমাদিগকে সাহায্য করে; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যখন নানবিধ, তখন ধর্মসাধনের বিভিন্ন প্রকার প্রণালীও প্রয়োজন। এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যত প্রচলিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। পৃথিবীতে যদি কুড়িটি ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে খুব ভাল; যদি চার শত ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে আরও ভাল; কারণ তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটি ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব যখন ধর্ম ও ধর্মভাবসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ক্রমশঃ অধিকসংখ্যাক মানুষ ধর্মপথে সাহায্য লাভ করিবে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাক—যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষ অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজস্ব একটি ধর্ম লাভ করে। ভক্তিযোগের ইহাই ভাব।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম আপনার বা আপনার ধর্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ অনেক, তথাপি সব পথই সত্য; কারণ পথগুলি একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটি সত্য, অন্যগুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় 'ইষ্ট' বলে।

অতঃপর শব্দ বা মন্ত্র-শক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরানে—শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর ঐগুলির আশ্চর্য প্রভাব!

তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়রূপ প্রতীক-বস্তু আছে। এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব। ধর্মের প্রধান প্রতীক-বস্তুগুলি কিন্তু ইচ্ছামত বা খেয়ালমত রচিত হয়

নাই। সেগুলি ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্বদাই রূপক-সহায়ে চিন্তা করিয়া থাকি; আমাদের সকল শব্দই বস্তুতঃ চিন্তার রূপক মাত্র, বিভিন্ন জাতি প্রকৃত কারণ না জানিয়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ কারণ মনের অন্তরালে, ঐ প্রতীকগুলি চিন্তার সহিত জড়িত; যেমন চিন্তা বা ভাব হইতে প্রতীক-বস্তু বাহিরে রূপ-গ্রহণ করে, তেমনি ঐ প্রতীক আবার ভিতরে ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এইজন্য ভক্তিযোগের এই অংশে এই-সব ভাবোদ্দীপক প্রতীক-বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে, তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না, এগুলি পুণ্যকর্ম। স্বর্গাদি গমনের বা কোন প্রকার বাহ্য বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা কর্মমাত্র। যিনি ভগবানকে ভালবাসিতে চান, যিনি ভক্ত হইতে চান, তাঁহাকে ঐ-সকল প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে কেনা-বেচার দোকানদারী ধর্মভাব পুঁটুলি বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবেই তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যাহা চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর—ভিখারীর ধর্ম।—মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে!১৮ সেই মূর্খ—যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ড অন্বেষণ করে! ভগবান্ হীরকখনিস্বরূপ, তাঁহার কাছে কাচখণ্ডবৎ স্বাস্থ্য খাদ্য বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে!—কি দুর্ভাগ্য! এই দেহ একদিন মরিবেই; তবে আর বার বার দেহের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে কি আছে? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও নিজ ধনের অতি অল্প অংশই নিজে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি তো দিনে চার-পাঁচ বার ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু শ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক তিনি লইতে পারেন না, তাঁহার নিজের দেহের জন্য যতটা জায়গা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকল বস্তু কখনই একা পাইতে পারি না। যদি না পাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবে—এ সব কে গ্রাহ্য

করে? যদি ভাল ভাল জিনিষ আসে, আসুক; যদি সেগুলি চলিয়া যায়—যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। আমরা ভগবানকে লাভ করিতে চলিয়াছি। ভগবানের নিকট গিয়া এ-জিনিষ ও-জিনিষ চাওয়া ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, অতি নিম্নাঙ্গের কর্মমাত্র। আমরা সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা করিতেছি। আমরা সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যাইতে পারি না। যদি ঐ বেশে আমরা কোন সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট্; তাঁহার নিকট আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে পারি না; দোকানদারের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কেনা-বেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলে যেমন পড়িয়াছেন যে, যীশু যিহোবার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোষাক দাও। হে ভগবান্ আজ আমার মাথাধরা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরও দু-ঘণ্টা বেশী প্রার্থনা করিব।' এইরূপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা নিজেদের একটু উচ্চতর মনোভাবাপন্ন মনে করিবেন। মনে করিবেন, এইরূপ ছোটখাটো জিনিষের জন্য প্রার্থনা করার ঊর্ধ্বে। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি শরীর-সুখের জন্য ঐভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি?

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব বাসনা—এমন কি স্বর্গ-গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গও এই-সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কিছু দুঃখ, কিছু সুখ ভোগ করিতে হয়। স্বর্গে না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। জ্ঞানের আলো সেখানে এতটুকু বাড়িবে না, স্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্যকর্মের ফলভোগ হইবে। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগসুখ তীব্রভাবে বর্ধিত হইবে।

এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার সেখান হইতে শত শত বার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে এই-সকল বাসনা অতিক্রম করা যায়? কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে? মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ ক্রীতদাসের মত, প্রকৃতির হাতে পুতুলের মত; প্রকৃতি খেলনার মত তাহাদিগকে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্য আঘাতে যে দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আমরা সর্বদা সেই দেহের যত্ন করিতেছি, এবং সেই জন্যই সর্বদা ভয়ব্যাকুলচিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। সেদিন পড়িতেছিলাম—হরিণকে নাকি প্রাণের ভয়ে প্রত্যহ প্রায় ৬০।৭০ মাইল ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তারপর কিছু খাইল। আমাদের জানা উচিত—আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত। হরিণ তবুও খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ানো আমাদের রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদনুরূপ জীবন খুঁজিতেছি। বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আমাদের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের পক্ষে ভয় করিবার এক প্রকার জিনিষই আছে, যথা, ব্যাঘ্রাদি; আর মানুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে।

এখন প্রশ্ন এই—আমরা কিরূপে এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? হিতবাদিগণ (Utilitarians) বলেন, 'ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরা ও-সবের কিছু জানি না। এই জগতেই সুখে বাস করা যাক।' যদি সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে ঐরূপ করিতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে তো তাহা করিতে দিবে না। আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাস হইয়া রহিয়াছেন, ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা করিবেন,

ততই আরও দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া সুখী হইবার জন্য কত পরিকল্পনা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া থাকে। দুই শত বর্ষ পূর্বে 'পুরাতন পৃথিবী'তে (Old World) লোকের অভাব অতি অল্পই ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, অভাবও শতগুণ বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্ততঃ যখন আমরা স্বর্গে গিয়া পরিত্রাণ পাইব, তখন আমাদের সব বাসনা পূর্ণ হইবে—তাই তো আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা! সর্বদাই একটা কিছু চাওয়া! ভিক্ষুক অবস্থায় মানুষ চায় টাকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্য জিনিষ চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্য কিছু চায়। এতটুকু বিশ্রাম নাই। কিভাবে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরও বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরও বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব ধনী হওয়া, এবং তাহা হইলে বাসনাও বাড়িতে থাকিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্রে পড়া যায়—স্বর্গেও দেবতারা মানুষের মত অনেক আমোদপ্রমোদ ও ছলনা করিয়া থাকে, তাহারা সবাই যে খুব ভাল, তাহা নয়; তারপর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল একটা ভোগবাসনা মাত্র। এটি ত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া তো অতি ছোট কথা, এরূপ চিন্তা করা অতি অমার্জিত মনোভাবের লক্ষণ। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব—এ ভাব যেমন, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়া গেলে ধর্ম ও ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

৫. প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

'প্রতীক' ও 'প্রতিমা'—দুইটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এখানে এই ' প্রতীক' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশে সকল ধর্মেই দেখিতে পাইবেন, উপাসনার নানাবিধ স্তর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সাধুগণের প্রতিমূর্তি পূজা করেন; এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কতকগুলি রূপ ও প্রতীকের উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্তার উপাসনা করেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি প্রেত-উপাসকদের কথা বলিতেছি। পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি, এখানে প্রায় আশী লক্ষ প্রেতোপাসক আছেন। তারপর আবার কতক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর সত্তা অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই-সকল বিভিন্ন সোপানের কোনটিকেই নিন্দা করে না, কিন্তু এই-সকল উপাসনাকেই এক প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাসকগণ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের মুক্তিলাভ হয় না; আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহা দ্বারা সেই সেই বিশেষ বস্তুই লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তার পরলোকগত পূর্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারেন। এই-সকল উপাস্য হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, তাহাকে 'বিদ্যা' অর্থাৎ 'বিশেষ জ্ঞান' বলে, কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। বেদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বরকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতীক সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নয়। ঐগুলিকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব কেহ কেহ যদি মনে

করে—দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনা দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে তাহাদের মহাভুল। ঐগুলি দ্বারা তাহারা বড়জোর কয়েকটি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ-সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি আর উচ্চতর কিছু বুঝে না, সে এই-সকল প্রতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও সুখসম্ভোগ লাভ করিবে। তারপর দীর্ঘকাল ভোগ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে নিজেই এই-সব প্রতীকোপাসনা ত্যাগ করিবে।

এই-সকল বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভালবাসা, প্রিয়জনের দেহের প্রতি ভালবাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্বদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে চাই। আমরা তাঁহাদের দেহের প্রতিই আসক্ত! আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছিল এবং মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবি, তাঁহাদের দেহ অপরিবর্তনীয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে পূর্বের মতই দেখিব। শুধু তাই নয়, আমাদের কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্টস্বভাব থাকিলেও মৃত্যু হইবামাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মত সাধু প্রকৃতির লোক আর জগতে কেহই নাই—সে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য হইয়া যায়। ভারতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার সমাধিস্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করে, এবং সেই শিশুটিই ঐ মন্দিরের দেবতা হইয়া যায়। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম খুব প্রচলিত, এবং এমন দার্শনিকের অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রতীক-পূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদ এই যে, প্রতীক বা

সমীপকারী সোপান-পরম্পরা যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটি অগ্রবর্তী সোপানে পৌঁছিবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নয় বরং উপকারী, কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন সারা জীবন প্রতীকোপাসনাতেই লাগিয়া থাকে। সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রচলিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা ভাল, ইহা দ্বারা আমাদের উচ্চতর ভাবসমূহ জাগরিত হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে পারি না। নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে পারি না। এই-সকল প্রতীকোপাসনায় ইহাই বড় বিপদ। লোকে মুখে বলিবে যে, এগুলি সোপান মাত্র–এই-সকল সোপানের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়–তাহারা সেই-সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। যদি কোন যুবক চার্চে না যায়, তবে সে নিন্দার্হ, কিন্তু যদি বৃদ্ধ বয়সেও কেহ চার্চে যায়, সে-ও তেমনি নিন্দার্হ; তাহার আর এই ছেলেখেলায় কোন প্রয়োজন নাই, চার্চের সাহায্যে তাহার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার আর এই-সব প্রতীক, পদ্ধতি ও প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন?

প্রতীকোপাসনার আর একটি প্রবল, প্রবলতম ভাব–গ্রন্থ বা শাস্ত্রের উপাসনা। সকল দেশেই দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা মনে করিয়া থাকে, ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন; কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে এবং যদি তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধকে পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, কিন্তু তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর না কেন?' তাহারা বলিবে, 'যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে।' গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশী মিথ্যা বলো না কেন, তাহাতে দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা

দিতে ইচ্ছা করি এবং যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহা হইলে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না; কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারসাজি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে মূর্খেরা দলে দলে আসিয়া আমার অনুসরণ করিবে। তারপর আবার কিছু লোক আছে, তাহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে; তাহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে, কিন্তু ঐ প্রচারকেরা বলে, আমরা যাহা বলিতেছি, যীশুখ্রীষ্টের মতও এইরূপই ছিল। যত সব আহাম্মকেরা তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়। বেদে বা বাইবেলে পাওয়া যায় না, এমন সব নূতন জিনিষ মানুষ লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যেভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চায়। যখন আপনারা কোন নূতন বিষয় শোনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন–ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব সম্বন্ধে এ-কথা আরও বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিতভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন; সুতরাং সেই ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। কৌশল হিসাবে এটি ভাল বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। এই সংস্কারকগণ এবং যাঁহাদিগকে আপনারা উদারমতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না; কিন্তু তাঁহারা যদি ঐভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্টদের (Christian Scientists) মতে যীশু একজন মস্ত রোগ-নিরাময়কারী, প্রেততত্ত্ববাদীদের (Spiritualists) মতে একজন মস্ত ভৌতিক (Psychic) এবং থিওজফিস্টদের মতে একজন 'মহাত্মা' ছিলেন। ধর্মগ্রন্থের একই বাক্য হইতে এই-সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ‘সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’১৯ –এই বাক্যের অন্তর্গত ‘সৎ’ শব্দের অর্থ বিভিন্ন মতবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা। সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন।

গ্রন্থোপাসনায় এই-সব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে। উহা একটা শক্তি। যে- সকল ধর্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীকদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্যবাসী–এক সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি ছিল। আরবীয়েরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ২০ লইয়া পলায়ন করিল এবং সেই ধর্মগ্রন্থের বলেই তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। য়াহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাহাদের একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহারা জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাহাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুড (Talmud) তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা সমুদয় ভাবগুলি পরিষ্কারভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, এবং উহা উপাস্য বস্তু। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন–সকলেই উহা দেখিবে, একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। কেহ কেহ বোধ হয় আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলির জন্য এই-সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে গ্রন্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

তারপর প্রতিমা বা মূর্তি ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা কোন-না-কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ মানবাকার প্রতিমা অর্চনা করিয়া থাকে, আর আমি মনে করি, উহাই সর্বোকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশু, গৃহ বা অন্য কোন মূর্তি অপেক্ষা বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করে, এই প্রতিমাটিই ঠিক; অপরে মনে করে, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টানরা মনে করেনঃ ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহাই ঠিক, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাত্মক। য়াহুদীরা মনে করেন দুই দিকে দুই দেবদূত-বসানো সিন্দুকের আকৃতিযুক্ত একটি মূর্তি নির্মাণ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন মূর্তি গঠিত হয়, তবে উহা অতিশয় ভয়াবহ। মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া 'কাবা' নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই উহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজার ইহাই অপূর্ণতা বা দোষ, তথাপি এগুলি সবই প্রয়োজনীয় সোপান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধবিশ্বাস যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ কি করিয়াছেন, বলিলে কি হইবে—তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চিন্তা করেন—মুশা এই এই খাইয়াছিলেন, তাহাতে তো আপনার ক্ষুধা মিটিবে না, সেইরূপ মুশার এই প্রকার মত ছিল—জানিলেই আপনার উদ্ধার হইবে না। এ-সকল বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখনও কখনও মনে হয় এই-সব প্রাচীন আচার্যগণের সহিত যখন আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য; আবার কখনও কখনও ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি স্বাধীন চিন্তা করায় বিশ্বাস করি। এই-সব পবিত্রস্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হইতেও একেবারে মুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন,

কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তুরূপে গ্রহণ করুন। তাঁহারা যেভাবে জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ নিজের চেষ্টায় জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে 'বাইবেল' হইতে হইবে—অনুসরণ করিতে হইবে না। বাইবেলকে শুধু পথের আলোকরূপে, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনরূপে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

গ্রন্থের মূল্য ঐ পর্যন্ত; কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার সময় বা কোনরূপ চিন্তা করিবার সময় দেখিবেন, আপনারা স্বভাবতই মনে মনে মূর্তি গড়িবার প্রয়োজন অনুভব করেন, এইরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। দুই প্রকার মানুষের রূপ-কল্পনার বা মূর্তির প্রয়োজন হয় না—নরপশুর, যে ধর্মের কোন ধার ধারে না; আর সিদ্ধপুরুষের, যিনি এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই দুই অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি। ভিতরে ও বাহিরে আমাদের কোন-না-কোনরূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন—উহা কোন পরলোকগত মানুষের হইতে পারে, অথবা কোন জীবিত নর বা নারীর হইতে পারে। ইহা ব্যক্তিত্বের উপাসনা—শরীর-কেন্দ্রিক, তবে ইহা খুব স্বাভাবিক। সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করার দিকে আমাদের ঝোঁক। সূক্ষ্ম হইতে যদি আমরা স্থূল না হইয়া থাকি, তবে কিভাবে এখানে আসিলাম? আমরা স্থূলভাবপ্রাপ্ত আত্মা, এইভাবেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং মূর্তিভাব যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, তেমনি মূর্তির সাহায্যেই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সদৃশবিধানের২১ মত—'বিষস্য বিষমৌধম্'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পিছনে ছুটিয়াই আমরা মানুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমরা সাকার ব্যক্তিভাবের উপাসনা করিতে বাধ্য; ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলি না কেন, ব্যক্তিরূপের বা সাকারের উপর আসক্ত হইও না—ইহা বলা খুব সহজ বটে, কিন্তু যে এ-কথা বলে, সে-ই ব্যক্তিভাবের উপর অতিশয় আসক্ত, বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তাহার তীব্র আসক্তি—মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় না, সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের অনুসরণ করিতে চায়। ইহাই পুতুলপূজা। ইহাই পুতুলপূজার বীজ—মূল কারণ; আর কারণই যদি থাকে, তবে কোন-না-কোন আকারে পৌত্তলিকতা আবার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কোন

সাধারণ নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমূর্তির উপর আসক্তি বা আকর্ষণ থাকা কি ভাল নয়? পাশ্চাত্যের লোকেরা বলিয়া থাকে, মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ, কিন্তু তাহারা কোন নারীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অনায়াসে বলিতে পারে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলো। তুমি আমার নয়নের মণি, তুমি আমার আত্মা'—এই-সব। তাহাদের যদি চারিটি করিয়া পা থাকিত, তবে তাহারা চার পায়ের হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা নিকৃষ্টতর পৌত্তলিকতা বা পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। একটি নারীকে 'আমার প্রাণ, আমার আত্মা' বলার অর্থ কি? এ ভাব তো পাঁচ দিনের মধ্যেই উবিয়া যায়, এ কেবল ইন্দ্রিয়গত আসক্তি মাত্র। তাই যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপ হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন? এই ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ কামনা অথবা তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট—কেবল একরাশ ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটি সুন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর গোলাপজল ছড়াইয়া দেন। তাহা হইলেও উহা স্বার্থপর কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধ বা জিনের মূর্তির সমক্ষে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া 'তুমিই আমার জীবনস্বরূপ' বলা কি উহা অপেক্ষা ভাল নয়? আমি বরং শত শত বার এইরূপই করিব।

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ প্রতীকোপাসনার স্বীকৃতি নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, যে-কোন বস্তুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির এক-একটি সোপানস্বরূপ—প্রত্যেকটি আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটতর করিয়া দেয়। অরুন্ধতী একটি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। যদি কেহ ঐ নক্ষত্র দেখিতে চায়, প্রথমে তাহাকে উহার নিকটবর্তী একটি বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র—তারপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে এই-সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমা মানুষকে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা—এ-সবই প্রতীকোপাসনা। ইহা মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না, এই ভাবও অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে। বুদ্ধ ও

খ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরই প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁহারা বলেন, ইঁহারা প্রতীক নন, ইঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই-সকল প্রতীক বা সোপান অবলম্বন করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই-সব প্রতীকোপাসনার সময় আমরা মনে করি, আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তাহা হইলে আমরা ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের উপাসনা করে ও মনে করে, সে উহা দ্বারাই মুক্ত হইবে, সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে করে যে, ভূত-প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে-কোন বস্তুর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন। মূর্তি ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে দেখুন। ঈশ্বরে অন্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্তু যে-কোন বস্তুতে ইচ্ছা ঈশ্বরভাব প্রবেশ করান। যে সাকার মূর্তিটি উপাসনা করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিবেন না। বরং যাহা কিছু উপাসনা করেন, সেই সব কিছু ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করিয়া দিন। এভাবে একটা বিড়ালের মধ্যেও আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। বিড়ালকে ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ তাঁহা হইতেই সব কিছু আসিয়াছে। তিনিই সবকিছুতে। একখানি চিত্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায়, কিন্ত ঈশ্বরকে চিত্ররূপে উপাসনা করা ভুল। চিত্রে ঈশ্বরচিন্তা করা খুবই ঠিক, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করা ভুল। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা তো খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ঈশ্বরের প্রতিমা প্রতীকমাত্র। ইহাই ভগবানের যথার্থ উপাসনা।

তারপর ভক্তিযোগে প্রধান আলোচ্য বিষয়—শব্দশক্তি বা নামশক্তি। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। হয় জগৎ নাম ও রূপের সমষ্টি অথবা শুধু নাম, এবং উহার নাম কেবল একটি মনোময় মূর্তি। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাত্মক নয়। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য, চিন্তাসমূহ যেন ঐ চিত্তহ্রদের তরঙ্গ আর এই-সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক

আবির্ভাব-প্রণালীকেই 'নাম-রূপ' বলে। 'নাম-রূপ' ব্যতীত কোন তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা কিছু সর্বদা একরূপ, তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত, কিন্তু যখনই উহা চিন্তা ও জড় পদার্থে পরিণত হয়, তখনই উহার নামরূপ চাই-ই চাই। আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শব্দ' হইতে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণের একটা মত আছে—শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় উহারই নাম 'শব্দব্রহ্মবাদ'। উহা একটি প্রাচীন ভারতীয় মত; ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ঐ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং সেখানে ঐ ভাব রোপণ করা হয়। এইরূপে সেখানে শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এ-কথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং নিরাকার, তখন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বাহিরে প্রক্ষেপ করা, বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্মাণ করিলেন, এই প্রলাপের অর্থ কি? ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন, আর সবই তাঁহাতে ফিরিয়া আসে, আবার বাহির হয়, আবার ফিরিয়া আসে। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মন হইতে যে-কোন ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা নাম-রূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির—একেবারে চিন্তাহীন হইয়াছে। যখনই চিন্তা আরম্ভ হইবে, অমনি উহা নাম ও রূপকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটি নির্দিষ্ট নাম ও একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নাম-রূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের যত প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার অনুরূপ একটি নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ, তেমনি এই জগৎও মনেরই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আর ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে একটি পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে আপনি সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিবেন। আপনাদের শরীরের স্থূল ভাগ এই স্থূল দেহ, আর চিন্তা বা ভাব উহারই অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর ভাগ। এ-দুটি চিরদিন অবিচ্ছেদ্য। ইহা তো প্রতিদিনই

দেখিতে পান। কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে যখন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহার চিন্তা বা ভাবসমূহও অমনি বিশৃঙ্খল হইতে থাকে। কারণ ঐ দুইটি একই বস্তু—একই বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্মভাগ মাত্র। মন ও জড়বস্তু বলিয়া দুইটি পৃথক্ পদার্থ নাই। একটি উচ্চ বায়ুস্তম্ভে যেমন একই বায়ুর ঘন ও পাতলা স্তর পর পর পাওয়া যায়—এবং বায়ুমণ্ডলের যতই ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়, ততই উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে—এই দেহ সম্বন্ধেও সেইরূপ। বরাবর ইহা একই বস্তু—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। দেহটা যেন নখের মত, নখ কাটিয়া ফেলুন, আবার নখ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিকতর স্থায়ী হয়, সর্বকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায়; আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অল্পকাল-স্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি—রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু; একে তিন, তিনে এক; একই বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা—সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটি থাকিলে অপরগুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্তমান। সুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, এই দেহ যে নিয়মে নির্মিত, এই ব্রহ্মাণ্ড যদি সেই একই নিয়মে নির্মিত হয়, তবে ইহাতেও নাম রূপ ও ভাব—এই তিনটি জিনিষ অবশ্যই থাকিবে। চিন্তা বা ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাই জগতের প্রকৃত প্রেরণাশক্তি এবং উহাকেই 'ঈশ্বর' বলে। আমাদের দেহের অন্তর্যামী ভাবকে 'আত্মা' এবং জগতের অন্তর্যামী ভাবকে 'ঈশ্বর' বলে। তারপর 'নাম', এবং সর্বশেষে 'রূপ'—যাহা আমরা দর্শন ও স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আপনার দেহের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে, আবার তাহার শ্রীঅমুক বা শ্রীমতী অমুক প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব—অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্মিত—তাহা রহিয়াছে; সেইরপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম এই নামকে 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া থাকে। বাইবেলে২২ লিখিত আছে—'আদিতে শব্দ ছিল, সেই শব্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিল, সে শব্দই ঈশ্বর।' সেই নাম হইতেই রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন। এই সর্বব্যাপী ভাব বা চেতনাকে সাংখ্যেরা 'মহৎ' আখ্যা প্রদান

করেন। এই নাম কি? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতির, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে, সমগ্র জগৎ যে উপাদানে নির্মিত, প্রত্যেকটি পরমাণুও সেই উপাদানে নির্মিত। আপনারা যদি এক-তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারিবেন।২৩ সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটু মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। যদি আপনারা একটি টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—সব দিক্ দিয়া উহাকে জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা সমগ্র জগৎকে জানিতে পারিবেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—মানুষই স্বয়ং ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ রহিয়াছেন। অতএব এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্মিত। প্রশ্ন—এই নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—ওঁ। প্রাচীন মিশরবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধক ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব—তাহা ওঁ।২৪

ইনিই অক্ষর অপরব্রহ্ম, ইনিই অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের—ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।২৫

ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক! ইহা বহির্জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী, উভয়েরই প্রতিভূ! এখন আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাব- গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়—যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ-রূপে দেখা যাইতে পারে, আর এইরূপ বিভিন্নভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটিই স্বয়ং এক-একটি সম্পূর্ণ জগৎ হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নাম-রূপ ও তাহাদের পশ্চাতে একটি ভাব থাকিবে। এই ভাবগুলিই প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক-একটি নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম বা শব্দ অনেক আছে; ভক্তিযোগীর বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া

থাকেন।এই তো নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল—এখন উহার সাধনে কি ফল হয়, তাহাই বিচার্য। এই-সব নামের প্রায় অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ঐ শব্দ বা মন্ত্রগুলি জপ করিয়াই আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।'২৬গুরু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইবেন এবং শিষ্যও সেইরূপ হইবে। এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ আসিতেছে, এবং গুরুপরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং পুনঃপুনঃ জপ করিলে নাম অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায় তাঁহাকে 'গুরু' বলে, আর যিনি পান তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে। যদি বিধি- পূর্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে সাধক ভক্তিযোগের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া রহিল। কেবল ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আসিবে।

'হে ভগবান্ আপনার কত নাম রহিয়াছে! আপনি জানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য! সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্তশক্তি রহিয়াছে। এই-সকল নাম উচ্চরণের কোন নির্দিষ্ট দেশকালও নাই, কারণ সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানেই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, আপনি এত দয়াময়! আমি অতি দুর্ভাগা যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।

৬. ইষ্ট

ইষ্ট সম্বন্ধে পূর্ব বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি—আশা করি, ঐ বিষয়টি আপনারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিবেন; কারণ ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা হইলে আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'ইষ্ট' শব্দটি ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ—ইচ্ছা করা, মনোনীত করা। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানুষের চরম লক্ষ্য এক—মুক্তিলাভ ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম বিদ্যমান, সেখানেই এই দুইটির একটি না একটি আদর্শ কাজ করিতেছে। অবশ্য ধর্মের নিম্নস্তরে ঐ ভাবগুলি তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট হউক, আর অস্পষ্টই হউক—আমরা সকলেই ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই দুঃখ এড়াইতে চাই—প্রতিদিন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা হইতে মুক্তি চাই; আমরা সকলেই মুক্তিলাভের—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিতেছি। জগতের সকল কার্যের মূলেই ঐ দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা। সকলের লক্ষ্য এক, তথাপি সেখানে পৌঁছিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই-সকল বিভিন্ন পথ বা উপায় নিরূপিত হইয়াছে। কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্মপ্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। এক প্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এখন আমরা যে-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের প্রকৃতিতে সন্তানবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সমধিক, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা, কাহারও স্বদেশপ্রীতি অতিশয় প্রবল—আবার কিছু লোক জাতিধর্মদেশ-নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন।

অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর যদিও আমরা প্রত্যেকেই এমন ভাবে কথা বলি, যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের প্রেরণাশক্তি, উহা দ্বারাই আমাদের

জীবন চালিত হইতেছে, কিন্তু বর্তমান কালে সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি একশতের বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্প কয়েকজন মাত্র জ্ঞানীই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই সর্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন, এবং আমার মত লোক তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদয় মহৎ ভাবেরই পরিণাম এই। তবে আমরা আশা করি, জগৎ যেন কখনও একেবারে এরূপ মহাপুরুষশূন্য না হয়।

যাহা হউক, পূর্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা দেখিতে পাই, একটি নির্দিষ্ট ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় আছে। সকল খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। প্রত্যেক চার্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেসবিটেরিয়ানের দৃষ্টি খ্রীষ্টের জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, যেখানে তিনি পোদ্দারদের মুদ্রা লেনদেন করিতে দেখিয়া 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ?' বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণকারিরূপে দেখিয়া থাকেন। কোয়েকারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিবেন, 'খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।' কোয়েকার খ্রীষ্টের ঐ ভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার খ্রীষ্ট-জীবনের কোন্ অংশ খুব ভাল লাগে, তিনি হয়তো বলিবেন, 'যখন খ্রীষ্ট পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' প্রত্যেক সম্প্রদায়ই খ্রীষ্টকে নিজের ভাবে দেখিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, একই বিষয়ে কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ আছে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই-সব অবান্তর বিভাগের একটিকে অবলম্বন করে এবং অপর সকল ব্যক্তির নিজ নিজ ধারণানুসারে জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার অধিকার তাহারা শুধু যে অস্বীকার করে, তাহা নয়, আর সকলে একেবারে ভ্রান্ত এবং কেবল তাহারাই অভ্রান্ত, এই কথা বলিতেও তাহারা সাহস করে। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা লড়াই করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, যে কেহ আমাদের মত বিশ্বাস করিবে

না, তাহাকেই মারিয়া ফেলিব। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিব? অপরে ভ্রান্ত নয়, শুধু এইটুকু বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতে চাই না; আমরা সকলকেই বলিতে চাই, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক পথে চলিতেছে। নিজ প্রকৃতির একান্ত প্রয়োজনে আপনি যে-পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আপনার পক্ষে সেই পন্থাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন—উহা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, নয় বলুন—পুরুষানুক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দেশ করুন না কেন, এই অতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকের দেহমনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, বিশেষ সাধনপ্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই 'ইষ্ট' বলে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, এবং আমাদের নিজস্ব সাধনপ্রণালীকে আমরা 'ইষ্ট' বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা। যাহার ঐরূপ ধারণা তাহার স্বভাবই হয়তো ঐরূপ। হয়তো সে এক মহা অহঙ্কারী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে এক সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আর একজন হয়তো বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কঠোরপ্রকৃতি; সে ভগবানকে ন্যায়পরায়ণ, শাস্তি-বিধাতা প্রভৃতি গুণান্বিত ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পনা করে, এবং আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপে দেখিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের 'ইষ্ট' বলি। আমরা নিজদিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, যেখানে ঈশ্বরকে ঐরূপেই—কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য কোনরূপে

দেখিতে পারি না। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহার উপদেশকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হয়তো আপনার এক বন্ধুকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিবেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট উপদেশ সে আর কখনও শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশ নির্ভুল ছিল, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টিই আর একটু বিস্তার করিয়া বলিলে বুঝা যাইবে—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন তত্ত্ব সত্য হইতে পারে, আবার একই কালে সত্য না হইতেও পারে। আপাততঃ এই কথা স্ববিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধু নিরপেক্ষ সত্যই এক, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য অবশ্যই নানাবিধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তিত, সর্বত্র সমভাবাপন্ন, কিন্তু আপনি, আমি—প্রত্যেকেই নিজ নিজ পৃথক্ জগৎ দেখি, শুনি ও অনুভব করি। অথবা সূর্যের কথা ধরুন। সূর্য এক, কিন্তু আপনি, আমি এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি উহাকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন অবস্থায় দেখি। একটু স্থান-পরিবর্তন করিলে সূর্য সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির সমগ্র দৃষ্টি পরিবর্তন হইয়া যাইবে। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিবর্তন হইলে সূর্যকে আর এক রূপে দেখা যাইবে। সুতরাং বুঝা গেল, আপেক্ষিক সত্য সর্বদাই বিবিধরূপে প্রতীত হয়। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়। এইজন্য যখন দেখিবেন, ধর্মসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাতবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যাসার্ধ এক সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বিন্দুগুলি কেন্দ্র হইতে যত দূরে, তাহাদের পরস্পর দূরত্ব তত অধিক; কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইলে তাহাদের দূরত্ব কমিয়া যায়; সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রেই মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরই ঐ কেন্দ্র এবং আমরা ব্যাসার্ধ। আমাদের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়াই আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি। এই স্তরে

দণ্ডায়মান হইয়া আমরা নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে বাধ্য। এই কারণে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গীই সত্য, সুতরাং কাহারও সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

বিভিন্নতারূপ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের প্রত্যেকের মত বিভিন্ন। আমরা যদি তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা আমাদের মতবিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসের ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র সমাধান—অগ্রসর হওয়া—কেন্দ্রের দিকে আগাইয়া যাওয়া; যত শীঘ্র উহা করিতে পারা যায়, তত শীঘ্র আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা অন্তর্হিত হইবে।

অতএব ইষ্টনিষ্ঠার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম নির্বাচন করিতে অধিকার দেওয়া। কেহই অপরকে তাহার নিজের উপাস্য পূজা করিতে বাধ্য করিবে না। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন না; অথবা আপনি যাঁহার উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব। সৈন্য, বলপ্রয়োগ বা যুক্তি দ্বারা মানুষকে দলবদ্ধ করিবার, বিশৃঙ্খলভাবে একই খোঁয়াড়ে পুরিবার এবং একই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বাধ্য করার সকল চেষ্টা চিরকাল বিফল হইয়াছে ও হইবে। কারণ ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এমন নরনারী একটিও দেখিতে পাইবেন না, যে কোন এক প্রকার ধর্মের জন্য চেষ্টা না করিতেছে; কিন্তু কয়জন লোক তৃপ্ত হইয়াছে! অথবা খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে। কেন?—কারণ অধিকাংশ লোক অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্মপদ্ধতি অবলম্বন করানো হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপঃ আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা তখন একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই রকম, এই জিনিষ এই রকম। আমার মনে ঐসব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? আমি কিভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না

জানিয়াই তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করেন; আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি বাধা-প্রাপ্ত হয়। আপনারা একটি গাছকে উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া কখনও বড় করিতে পারেন না। যেদিন আপনারা শূন্যের উপর বা প্রতিকূল মৃত্তিকায় গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেইদিন আপনারা একটি ছেলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া তাহাকে আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে আপনারা সাহায্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া আপনারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্নগুলি দূর করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব-জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যস, আপনার কাজ ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। বাকীটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পায়। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন; যাহা শিখিলেন তাহা বাড়ী গিয়া নিজ মনের চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন আপনারাও ঠিক সেইভাবে চিন্তা করিয়াছেন, আমি সেইগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন কালে আপনাদিগকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনারা নিজেরাই নিজেদের শিখাইবেন—হয়তো আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি। ধর্মরাজ্যে এ-কথা আরও সত্য। নিজে নিজেই ধর্ম শিখিতে হইবে।

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আমার পিতার আছে? শিক্ষকেরই বা এই-সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এ-সব জিনিষ আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার অধিকার কি সমাজের আছে? হয়তো ওগুলি ভাল

ভাব, কিন্তু ওগুলি আমার পথ না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে ভুলপথে শিক্ষা দিয়া নষ্ট করা হইতেছে—জগতে আজ কি ভয়াবহ অমঙ্গল রাজত্ব করিতেছে, ভাবুন দেখি! কত কত সুন্দর ভাব, যেগুলি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলি দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! ভাবুন দেখি, এখনও আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের শৈশবের ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে কী কুসংস্কাররাশি রহিয়াছে! ভাবুন দেখি, ঐ-সকল কুসংস্কার আপনাদের কত অনিষ্ট করিয়াছে! আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলেমেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না—তা একরূপ ভালই বলিতে হইবে; কারণ একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কাজের পিছনে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, মানুষ তাহা জানে না। একথা অতি সত্য যে, 'দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্বোধেরা সেদিকে বেগে আগাইয়া যায়।' গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে?—এই 'ইষ্টনিষ্ঠা' দ্বারা। নানাপ্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই—জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনার উপর চাপাইয়া দিবার অধিকার আমার নাই। আমার কর্তব্য—আপনার সম্মুখে এই-সব আদর্শ তুলিয়া ধরা—যাহাতে আপনি বুঝিতে পারেন, কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে, কোন্‌টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং কোন্‌টা আপনার প্রকৃতিসঙ্গত। যেটি আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেটি গ্রহণ করুন, এবং সেই আদর্শ লইয়া ধৈর্যের সহিত সাধন করুন। এটিই আপনার ইষ্ট, আপনার বিশেষ আদর্শ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখনও ধর্ম হইতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত সাধনা প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ। আমর নিজের একটা ভাব আছে—পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা আমাকে গোপন রাখিতে হইবে; কারণ আমি জানি, ওটি আপনার ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিব কেন? তাহারা আসিয়া আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। আমার ভাব তাহাদের নিকট

প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াই, তবে তাহারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অতএব বলিয়া বেড়াইয়া ফল কি? এই ইষ্ট প্রত্যেকেরই গোপন রাখা উচিত; উহা আপনি জানিবেন, এবং আপনার ভগবান্ জানিবেন। ধর্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে, সমবেত মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চতর ধর্ম অর্থাৎ সাধন-রহস্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে না; কেহ বলা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আমার ধর্মভাবগুলি জাগাইয়া তুলিতে পারি না।

সমবেতভাবে উপাসনারূপ এই হাস্যকর অনুষ্ঠানের ফলে হইতেছে কি? ইহা ধর্ম লইয়া উপহাস করা—ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা। আধুনিক গির্জাগুলিতে ইহার ফল প্রত্যক্ষ। মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের 'ওঠ-বস' সহ্য করিবে? এখনকার গির্জার ধর্ম সেনানিবাসে সৈন্যগণের কসরতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দুক কাঁধে তোল, হাঁটু গাড়ো, বই হাতে কর—সব ধরাবাঁধা। দু-মিনিট ভাবভক্তি, দু-মিনিট জ্ঞানবিচার, দু-মিনিট প্রার্থনা—সব পূর্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই-সব ধর্মের বিকৃত অনুকরণ ও হাস্যকর অনুষ্ঠান এখন আসল ধর্মকে বিতাড়িত করিয়া বসিয়া আছে; আর যদি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ চলে, তবে ধর্ম একেবারে লোপ পাইবে। গির্জাগুলি যত খুশী মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক, কিন্তু উপাসনার—আসল সাধনার সময় আসিলে যীশু যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ করিতে হইবে। 'প্রার্থনার সময় তোমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং গোপনে বিরাজমান তোমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা কর।' ২৮

ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম সাধন করিতে হয়, যদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় এবং যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতি-লাভ করিতে হয়, তবে এই ইষ্টনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, আপনারা যেন আমার কথার এরূপ ভুল অর্থ বুঝিবেন না যে, আমি

গুপ্তসমিতি-গঠন সমর্থন করিতেছি। যদি শয়তান কোথাও থাকে, তবে গুপ্তসমিতিগুলির ভিতরেই তাহাকে খুঁজিব। গুপ্তসমিতিগুলি পৈশাচিক পরিকল্পনা।

‘ইষ্ট’ একটি পবিত্র ভাব, ইহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নয়; কিন্তু কি অর্থে? অন্যের নিকট নিজ ইষ্টের কথা বলিব না কেন? কারণ নিজের প্রাণের বস্তু বলিয়া উহা পরম পবিত্র। উহা দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা জানিবে কি করিয়া? কোন ব্যক্তির প্রকৃতি এইরূপ হইতে পারে যে, সে ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না, সে কেবল নির্গুণ ঈশ্বরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের উপাসনা করিতে পারে। মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম, এবং সে বলিতে লাগিল—ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তোমার আমার—সকলের মধ্যেই আত্মস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বর আছেন। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা গোপন রহিল না।

কোন বড় ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখনও গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এগুলি পাশ্চাত্য ভাব—এখন ঐগুলি ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমরা এ-সব গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না, আর ভারতে এই গুপ্তসমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইওরোপে কাহাকেও চার্চের মতের বিরোধী ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে গরীব বেচারারা নিজেদের মনোমত উপাসনার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করার দরুন কখনও কাহার উপর অত্যাচার করা হয় নাই। কখনও গুপ্ত ধর্মসমিতি ছিল না, সুতরাং ঐরূপ কোন ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন। ঐ-সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হয়। এ পৃথিবীর যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এইসব গুপ্তসমিতি কত অনিষ্টের মূল—কত সহজে এগুলি বাধাহীন প্রেমসমিতি ও ভুতুড়েসমিতি হইয়া

দাঁড়ায়। অপর নরনারীর হাতের পুতুল হইয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই-সব বলিতেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার সারা জীবনে হয়তো পাঁচ-সাত জন নরনারী আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই কয় জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি হয়, আমি লোকের ভিড় চাই না। কতকগুলি লোক জড়ো হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের দ্বারাই জগতের ইতিহাস রচিত হইয়াছে—অবশিষ্টগুলি তো উচ্ছৃঙ্খল জনতা। এই-সমস্ত গুপ্তসমিতি ও বুজরুকি-ভাব নরনারীকে অপবিত্র, দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে; দুর্বল ব্যক্তিদের ইচ্ছাশক্তি নাই, সুতরাং তাহারা কখনও কোন কাজ করিতে পারে না। অতএব গুপ্তসমিতিগুলির সংস্রবে থাকিবেন না। মনে ঐ-সব ভ্রান্ত রহস্যপ্রিয়তা উদিত হইবামাত্র একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। যে সামান্য পরিমাণেও অপবিত্র, সে কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। একরাশ ফুল দিয়া পচা ঘা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। আপনারা কি মনে করেন—ভগবানকে ঠকাইতে পারিবেন? কেহই পারে না। আমি অকপট নরনারী চাই, ঈশ্বর আমাকে এই-সব ভূত, উড়ন্ত দেবদূত ও শয়তান হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিধা সাধারণ মানুষ হউন।

অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কারগুলি—দেহের যে-সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা-আপনি হইয়া যায়, সেইগুলি ইহার উদাহরণ। ইহা অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বৃত্তি আমাদের আছে—তাহাকে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি বলা যায়, এই বুদ্ধি নানা বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে—তাহাকে প্রাতিভ-জ্ঞান বলে। উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুশকিল। আজকাল প্রত্যেকেই আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং অলৌকিক দাবী উপস্থিত করে। তাহারা

বলে, 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি—আমার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড়ো হও, আমার পূজা কর।'

দিব্য প্রেরণা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাইবে? প্রথমতঃ দিব্যজ্ঞান কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবের বিরোধী নয়, উহার বিকাশমাত্র। এইরূপে আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়াই দিব্যজ্ঞানে পৌঁছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না। যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের স্বাভাবিক সহজাত গতিগুলি তো যুক্তির বিরোধিতা করে না। রাস্তা পার হইবার সময় যাহাতে গাড়ী চাপা না পড়িতে হয়, সেজন্য অজ্ঞাতসারে আপনার দেহের গতি কিরূপ হইয়া থাকে? আপনার মন কি বলে, দেহকে এরূপে রক্ষা করা নির্বোধের কাজ হইয়াছে? কখনই বলে না। প্রকৃত প্রেরণা কখনও যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা প্রেরণা নয়, বুজরুকি। দ্বিতীয়তঃ এই দিব্যপ্রেরণা সকলের কল্যাণকর হওয়া চাই। নাম যশ বা ব্যক্তিগত লাভ যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উহা দ্বারা সর্বদাই জগতের—সমগ্র মানবের কল্যাণই হইবে। দিব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবে। যদি এই লক্ষণগুলি মিলে, তবে অনায়াসে উহাকে প্রেরণা বা প্রাতিভ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্তমান অবস্থায় দশ লক্ষের মধ্যে একজনেরও এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কিনা সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে, এবং আপনারা প্রত্যেকেই এইরূপ দিব্যপ্রেরণাসম্পন্ন হইবেন। এখন তো আমরা ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র, এই দিব্যপ্রেরণা হইলেই আমাদের যথার্থ ধর্ম আরম্ভ হইবে। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছিলেন, 'এখন আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সামনাসামনি দেখিব।' জগতের বর্তমান অবস্থায় এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি' বলিয়া মিথ্যা দাবী শুনা যায়, এরূপ আর কখনই শুনা যায় নাই, এবং লোকে বলিয়া থাকে, মেয়েদের

দিব্যপ্রেরণাশক্তি আছে এবং পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উন্নত হয়। এ-সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। দিব্যপ্রেরণাসম্পন্না নারী যত আছে, ঐরূপ পুরুষও তত আছে। যদিও মেয়েদের এইটুকু বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মূর্ছা ও স্নায়ুরোগ বেশী। জুয়াচোর ও ঠকের কাছে প্রতারিত হওয়া অপেক্ষা অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল। ব্যবহার করিবার জন্য আপনাকে বিচারশক্তি দেওয়া হইয়াছে, দেখান—আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐরূপ করিলে পর উহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে হাত দিতে পারিবেন।

ঐ ভাব সমগ্র জাতিকে হীনবীর্য করে, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, সর্বদা একটা ভূত বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। এই-সব আজগুবী গল্প স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত করে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য হইয়া যায়।

আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ-সব অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতর নাই। 'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ'—সে মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা কূপ খুঁড়িতে যায়। সে মূর্খ, যে হীরার খনির নিকট থাকিয়া কাচদণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরই সেই হীরক-খনি। আমরা ভূতের অথবা এইরূপ সমুদয় উড়ন্ত পরীর গল্পের প্রতি বৃথা আসক্ত হইয়া ভগবানকে ত্যাগ করিতেছি—ইহা বাস্তবিক আমাদের মূর্খতা।

ঈশ্বর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি ছাড়িয়া এই-সব বৃথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া অবনতির লক্ষণ! পরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট করিয়া যদি আমাকে প্রত্যেকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে তো আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া প্রেমের ভগবানকে অন্বেষণ কর। ইহাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। পবিত্রতার শক্তি অপেক্ষা আর কোন্ শক্তি বড়? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও এই ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে পারে না; অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক—কোন দিক্ দিয়া দুর্বল হইবেন না। ঐ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড কেবল

আপনাকে দুর্বল করিয়া ফেলে; অতএব ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব অসত্য, অনিত্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সমুদয় মিথ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। ‘অসার, অসার–সকলই অসার–শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁহার সেবা করা ছাড়া আর সবই বৃথা।’

৭. গৌণী ও পরাভক্তি

দুই-একটি ছাড়া প্রায় সকল ধর্মেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মেই সগুণ ঈশ্বরের ধারণা আছে এবং সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও উপাসনার ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে, বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ঠিক সেই ভাবে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের পূজা করিয়া থাকে। কোন উচ্চতর পুরুষকে ভালবাসিতে হয়, যিনি আবার মানুষকে ভালবাসিতে পারেন; ভক্তি ও উপাসনা করিবার এই ভাব সর্বজনীন। নানাবিধ ধর্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের নিম্নতম স্তর বাহ্য অনুষ্ঠান-বহুল—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্ম ধারণা একরূপ অসম্ভব, সুতরাং মানুষ সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থূল আকারে পরিণত করিতে চায়। ঐ অবস্থাতেই নানবিধ অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গ—ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঐ পর্যায়ভুক্ত। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গুলির প্রীতিপ্রদ, যাহা কিছু অমূর্তভাবকে মূর্ত করিবার সহায়তা করে, তাহাই মানুষ উপাসনার উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।

সময়ে সময়ে সকল ধর্মেই সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ মানুষ যতদিন বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্থূল মূর্ত বস্তু ধরিয়া থাকিতে চাহিবে, যাহা তাহাদের ভাবরাশির আধার হইতে পারে—এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরের ভাবময়ী মূর্তিগুলির কেন্দ্র হইবে। মুসলমান ও প্রোটেস্টান্টরা সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের প্রভূত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন;

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠানপদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। এগুলির প্রবেশ নিবারণ করা যায় না। অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করিয়া জনসাধারণ একটি প্রতীকের পরিবর্তে অপর একটি গ্রহণ করে মাত্র। একজন মুসলমান অ-মুসলমানের অনুষ্ঠিত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহৃত প্রতিটি মূর্তিকে পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার নিজের কাবা-মন্দির সম্বন্ধে সে আর ঐরূপ মনে করে না। প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, সে কাবা-মন্দিরে রহিয়াছে; এবং সেখানে তীর্থ করিতে গেলে তাহাকে ঐ মন্দিরের দেয়ালে অবস্থিত 'কৃষ্ণপ্রস্তরটিকে' চুম্বন করিতে হয়। তাহার বিশ্বাস—ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরে মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ-বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। তারপর আবার 'জিমজিম' কূপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কূপ হইতে যে-কেহ একটু জল তুলিবে, তাহারই পাপ ক্ষমা করা হইবে এবং পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া সে অমর হইয়া থাকিবে।

অন্যান্য ধর্মে দেখিতে পাই, প্রতীক একটি গৃহের রূপ ধরিয়া প্রবেশ করিতেছে। প্রোটেস্টান্টদের মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গির্জা অধিকতর পবিত্র। তাহাদের পক্ষে এই গির্জা একটি প্রতীকমাত্র। তারপর আছে শাস্ত্রগ্রন্থ। অনেকের ধারণা অন্যান্য প্রতীক অপেক্ষা শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক। ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্তি পূজা করে, প্রোটেস্টান্টরা তেমনি ক্রুশকে ভক্তি করে। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা; এবং কেনই বা আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব? মানুষ এই-সকল প্রতীকের উপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার তো কোন যুক্তি নাই। প্রতীকের পিছনে উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিরূপেই মানুষ ঐগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বিশ্বই একটি প্রতীক—উহার মধ্য দিয়া, উহার সহায়তায় আমরা উহার অতীতে অবস্থিত—উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। মানুষের নিম্নতর প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রতীক অবলম্বনের মাধ্যমে জগদতীত বস্তুকে ধরিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, আমরা প্রতীকের লক্ষ্য বস্তুকে—জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ধরিবার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের

চরম লক্ষ্য চৈতন্য—জড় নয়। ঘণ্টা, প্রদীপ, মূর্তি, শাস্ত্র, গির্জা, মন্দির, অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতীক খুব ভাল বটে, ধর্মরূপ চারাগাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুব সহায়ক বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত; উহার বেশী আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, চারাগাছটি আর বড় হয় না! কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত; ঐগুলি ধর্মরূপ চারাগাছটিকে বড় হইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ-সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার বিকাশ হয় নাই।

অতএব যদি কেহ বলে, এই-সকল প্রতীক ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি চিরকালের জন্য রাখিতে হইবে, তবে সে ভ্রান্ত; কিন্তু যদি সে বলে, ঐগুলি সাধকের নিম্নতর অবস্থায় আত্মার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। এখানে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে আপনারা যেন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তির প্রভূত বুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়তো শিশুমাত্র বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বুদ্ধির দিক্ দিয়া আপনারা সকলেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার কোনপ্রকার ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়তো আকাশ বা একটা বিরাট সবুজ প্রান্তর অথবা সমুদ্র বা মরুভূমির ভাব মনে আনিতে পারেন, অবশ্য যদি শেষের দুইটি আপনি দেখিয়া থাকেন। এগুলি সবই জড় প্রতিমূর্তি, এবং যত দিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই-সকল জড়বস্তুর প্রতিমূর্তির সাহায্য আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরই থাকুক অথবা বাহিরেই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা সকলেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক; এবং পৌত্তলিকতা ভাল, কারণ উহা মানুষের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও দেব-মানবেরাই পারেন। বাকী সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন রূপ ও

আকারবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আপনারা কি জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুতুলের পূজা করিতেছেন না? যে বলে, আমি শরীর, সে তো জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। আপনারা সকলেই আত্মা–নিরাকার আত্মস্বরূপ–অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ; আপনারা কখনই জড় নন। অতএব যে-ব্যক্তি সূক্ষ্মধারণায় অসমর্থ, নিজেকে জড়বস্তু ও দেহ বলিয়া ভাবে এবং সেরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে নিজ স্বরূপ চিন্তায় অসমর্থ, সেই পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন মানুষ পরস্পর বিবাদ করে, একজন আর একজনকে পৌত্তলিক বলিয়া গালি দেয়! অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্য পুতুলকে ঠিক মনে করে এবং অপরের উপাস্য পুতুলকে ভ্রান্ত মনে করে!

অতএব আমাদিগকে এই-সকল শিশুজনোচিত ধারণা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে, আমাদিগকে অজ্ঞজনোচিত বৃথা বাদানুবাদের উচ্চে উঠিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি অসার কথার সমষ্টি মাত্র–কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ, ইহাদের মতে ধর্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতির-প্রকাশ মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশ্বাস মাত্র, ইহদের মতে ধর্ম পূর্বপুরুষগণের কয়েকটি বিশ্বাস-সমষ্টি, ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কারের সমষ্টি– জাতীয় ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার বলিয়াই তাহারা সেগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই-সব ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, দেখিতে হইবে–সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাণী, ধীরে ধীরে আলোকের অভিমুখে আবর্তিত হইতেছে; উহা যেন এক আশ্চর্য বৃক্ষশিশু, ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া এক অমূর্ত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে সত্যের নাম 'ঈশ্বর'; এবং উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি–প্রথম ঘূর্ণন সর্বদা জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার উপায় নাই।

এই-সকল অনুষ্ঠানের হৃদয়স্বরূপ এবং অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– নামোপাসনা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম এবংপৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উহাদের ভিতর 'নামোপাসনা' বলিয়া একটি অপূর্ব ভাব প্রচলিত। 'নাম' অতিশয় পবিত্র বলিয়া

পরিগণিত। বাইবেলে পড়িয়াছি—হিব্রুদের নিকট ভগবানের নাম এত পবিত্র মনে করা হইত যে, যে-কেহ উহা উচ্চারণ করিতে পারিত না বা যে-কোন সময়ে উহা উচ্চারণ করা চলিত না, কিছুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। ভগবানের নাম পবিত্রতম এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহাও সত্য। বিশ্বজগৎ নামরূপ বৈ আর কি? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না, উহারা অভিন্ন। চেষ্টা করুন, যদি কেহ এ-দুইটিকে পৃথক্ করিতে পারেন! যখনই আপনারা চিন্তা করেন তখনই শব্দ-অবলম্বনে চিন্তা করেন। শব্দগুলি সুক্ষ্ম ভিতরের অংশ এবং ভাব বাহ্য অংশ; এ-দুইটি সর্বদা একসঙ্গে আসিবে, ইহাদের পৃথক্ করা যায় না। একটি আর একটিকে লইয়া আসে। ভাব থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাহ্য প্রতীক-স্বরূপ, উহার পিছনে রহিয়াছে ভগবানের পুণ্য নাম। প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে আছে উহার নাম। যখনই আপনি আপনার বন্ধু-বিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম। তাৎপর্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের চিত্তের মধ্যে রূপ-জ্ঞান ব্যতীত নাম-জ্ঞান আসিতে পারে না, নাম-জ্ঞান ব্যতীত রূপ-জ্ঞান আসিতে পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহিরের ও ভিতরের দিক্। এই কারণে সমগ্র জগতে ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত ঘোষিত এবং নামোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নাম-মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্মে সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধু-সন্তের পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন? আলোকের স্পন্দন সর্বত্র রহিয়াছে। পেচক অন্ধকারে দেখিতে পায়; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, অন্ধকারেও আলো আছে, কিন্তু মানুষ তাহাতে আলো দেখিতে পায় না। ঐ আলোকের স্পন্দন একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে—যথা প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে,

মানুষের চক্ষুস্নায়ুতে আলোক অনুভূত হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সকল প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে মানুষের মধ্যে চিনিতে পারে। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য মানুষের দিব্য মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়, তখন—কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, এবং যতদিন সে মানুষ থাকিবে, ততদিন এইরূপই করিবে। মানুষ ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারিবে ভগবানকে মানুষরূপে চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে পাই—প্রতীক বা মূর্তি, নাম ও দেবমানব। সকল ধর্মেই এগুলি কোন-না-কোন আকারে আছে; তথাপি দেখিতে পাইবেন, মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতে চায়। কেহ বলে, আমি যে-নাম সাধনা করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম; আমি যে-রূপের উপাসক, তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ; আমি যে-সব দেবমানব মানি, তাঁহারাই ঠিক; তোমার গুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্তমান কালের খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ পূর্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রীষ্টধর্মেরই পূর্বাভাস মাত্র। অবশ্য তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্মে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এই ভাব অন্ততঃ গোঁড়ামি অপেক্ষা অনেকটা ভাল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহারা এরূপ কথাও বলিতেন না, তাঁহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া আর সবকিছু তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। ধর্ম জাতি বা শ্রেণী-বিশেষে এই ভাব সীমাবদ্ধ নয়। লোকে সর্বদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও তাহাই করিতে হইবে; এবং এখানেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমাদের উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে ভাবগুলিকে আমরা আমাদের নিজস্ব—সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্বে অন্যের ভিতর ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমরা যেভাবে ঐগুলি ব্যক্ত করি, তাহা অপেক্ষা পরিস্ফুটভাবেই ব্যক্ত ছিল।

ভক্তির এই-সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়; কিন্তু যদি সে অকপট হয়, যদি সে প্রকৃতপক্ষেই সত্যে পৌঁছিতে চায়, তবে সে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এক ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আর মূল্য থাকে না। মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক—প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহ ধর্ম চায়, তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হইতেই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়। কে তাঁহাকে চায়? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম—মতমতান্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই; ধর্ম—হওয়া; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। আমরা দেখিতে পাই—সকলেই ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জগতের সর্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলে, কিন্তু যদি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছ? তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ?' কয়জন লোক সাহসের সহিত বলিতে পারে, 'করিয়াছি'? তথাপি তাহারা পরস্পর লড়াই করিতেছে!

একবার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা; আর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, কিছুতেই আর তর্কের বিরাম হয় না। সেই স্থান দিয়া এক মুনি যাইতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে আহ্বান করিল। তিনি প্রথমে শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শিবকে দেখিয়াছ? তোমার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে? যদি না থাকে, তাহলে কিরূপে জানিলে—তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা?' তারপর তিনি বৈষ্ণবকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি বিষ্ণুকে দেখিয়াছ?' সকলকে ঐ প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না, এবং সেই জন্যই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল; যদি তাহারা সত্য সত্যই ঈশ্বরকে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী জলে ডুবাইলে শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিবাদ-বিসংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা ধর্মের কিছুই জানে না; ধর্ম তাহাদের নিকট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কতকগুলি বাজে কথামাত্র। সকলেই তাড়াতাড়ি এক-একখানা বড়

পুস্তক লিখিতে ব্যস্ত—উহার কলেবর যতদূর সম্ভব বড় করিতে হইবে, সেজন্য যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে থাকে, অথচ কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করে না। তারপর তাহারা উহা প্রকাশ করিয়া পৃথিবীতে যে গণ্ডগোল পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, তাহা আরও বাড়াইয়া তুলে।

সংসারের অধিকাংশ লোকই নাস্তিক। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিকের—জড়বাদীদের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত। ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্মবাদী নাস্তিক অপেক্ষা ভাল। ধর্মবাদী নাস্তিকেরা ধর্মের কথা বলে, ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু কখনই ধর্ম চায় না—ধর্ম বুঝিবার বা সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করে না। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাক্যগুলি স্মরণ করুন, 'চাহিলেই তোমাকে দেওয়া হইবে, অনুসন্ধান করিলেই পাইবে, করাঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া যাইবে।' এই কথাগুলি উপন্যাস রূপক বা কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। জগতে যে-সকল ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে উৎসারিত ঐ কথাগুলি কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা নয়। ঐগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির ফল—ঐগুলি এমন একজনের কথা, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন—ভগবানের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন; আপনি আমি এই বাড়ীটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্পষ্টভাবে তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবানকে চায় কে?—ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, দুনিয়াসুদ্ধ লোক ভগবানকে চাহিয়াও পাইতেছে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানুষের এমন কি অভাব আছে, যাহা পূরণ করিবার উপযোগী বস্তু বাহিরে নাই। মানুষ নিঃশ্বাস নিতে চায়—তাহার জন্য বায়ু আছে। মানুষ খাইতে চায়—সেজন্য খাদ্য রহিয়াছে। কোথা হইতে এই-সব বাসনার উৎপত্তি? বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব হইতে। আলোকই চক্ষু উৎপন্ন করিয়াছে, শব্দ হইতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ মানুষের মধ্যে যে-কোন বাসনা আছে, তাহাই পূর্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; পূর্ণত্বলাভের—সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল, যদি না কেহ উহা আমাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকে? অতএব যাঁহার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবেন। কিন্তু কাহার

এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব কিছুই চাই। আপনারা সমাজে যাহা দেখিতে পান, উহাকে 'ধর্ম' বলা যায় না। 'আমার গৃহিণীর সমগ্র পৃথিবী হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে, কিন্তু এখন ফ্যাশন—জাপানী কোন জিনিষ ঘরে রাখা, তাই তিনি একটি জাপানী ফুলদানি কিনিয়া ঘরে রাখিলেন'—অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এইরূপ। ভোগের জন্য তাহাদের সর্বপ্রকার বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না থাকায় জীবনটা যেন ঠিকভাবে চলিতেছে না। সমাজে সমালোচনা হইবে, সেই জন্যই একটু-আধটু ধর্ম চাই। আজকাল পৃথিবীতে ধর্মের এই অবস্থা।

এক শিষ্য তাহার গুরুর নিকটে গিয়া বলিল, 'গুরুদেব, আমি ধর্মলাভ করিতে চাই।' গুরু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিত, 'আমাকে ধর্মলাভের উপায় করিয়া দিন।' গুরু অবশ্য এ-বিষয়ে শিষ্য অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গরমের সময় তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন। যুবকটি জলে ডুব দিবামাত্র গুরু তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে জলের নীচে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্য অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করিলে গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্বাপেক্ষা কিসের অভাব বোধ হইতেছিল?' শিষ্য উত্তর করিল, 'নিঃশ্বাসের জন্য বায়ুর অভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল।' তখন গুরু বলিলেন, 'ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরূপ অভাব বোধ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে এক মুহূর্তেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।' যতদিন না ধর্মের জন্য আপনাদের ঐরূপ ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, কিছুতেই কিছু হইবে না। যতদিন না হৃদয়ে এই ধর্মপিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক অপেক্ষা আপনি কিছুমাত্র উন্নত নন। নাস্তিক বরং অকপট, আপনি তা নন।

একজন মহাপুরুষ বলিতেন, 'মনে কর, এ ঘরে একটা চোর রহিয়াছে; সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে যে, পাশের ঘরে একতাল সোনা আছে, এবং ঐ দুইটি ঘরের মধ্যে

আছে একটি খুব পাতলা দেওয়াল। এরূপ অবস্থায় ঐ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে? তাহার ঘুম হইবে না, সে খাইতে পারিবে না, সে কিছুই করিতে পারিবে না—কেবল কিরূপে ঐ সোনার তাল সংগ্রহ করিবে, সেইদিকে তাহার মন পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে কিরূপে ঐ দেওয়াল ছিদ্র করিয়া সোনার তালটা লইবে। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি মানুষ যথার্থ বিশ্বাস করিত যে, সুখ আনন্দ ও মহিমার খনি স্বয়ং ভগবান্ এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণভাবে সাংসারিক কাজ করিতে সমর্থ হইত?' যখনই মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভগবান্ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে, কিন্তু যখনই কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যেভাবে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এক জীবন আছে; যখনই সে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গুলিই মানুষের সর্বস্ব নয়; যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী নিত্য অক্ষয় আনন্দের তুলনায় এই সীমাবদ্ধ জড়দেহ কিছুই নয়, তখনই সে নিজে সেই আনন্দ লাভ না করা পর্যন্ত পাগলের মত উহারই অনুসন্ধান করে। এই উন্মত্ততা, এই তৃষ্ণা—এই ঝোঁককে ধর্মজীবনের 'জাগরণ' বলে; যখনই মানুষের এই অবস্থা হয়, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ হইতে অনেক দিন লাগে। এই-সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রার্থনা, তীর্থ-পর্যটন, শাস্ত্রাদি, কাঁসর-ঘণ্টা, প্রদীপ-পুরোহিত ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি। ঐগুলির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। আর যখনই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই উহা স্বভাবতই উহার মূলকারণ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ করিতে চায়। শত শত যুগের ধূলি-আচ্ছাদিত লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোন উপায়ে ঐ ধূলি অপসারিত হইলে আবার উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাত্মাও শত শত যুগের অপবিত্রতা, দুর্বৃত্ততা ও পাপের ধূলিজাল আবৃত রহিয়াছে। এই-সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, পরের কল্যাণ সাধন করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া অনেক জন্মের পরে যখন সে যথেষ্ট পবিত্র হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে তখন জাগরিত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু এই-সকল অনুষ্ঠান—প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি ধর্মের আরম্ভ মাত্র, এগুলিকে যথার্থ ঈশ্বরপ্রেম বলা যাইতে পারে না। প্রেমের কথা আমরা সর্বত্র শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবানকে ভালবাসো, কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন হালকাভাবে ভালবাসার কথা বলিত না। প্রত্যেকে বলে, সে ভালবাসিতে পারে; কিন্তু পাঁচ মিনিটেই বুঝিতে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। প্রত্যেকটি নারীই বলিয়া থাকেন, তিনি ভালবাসিতে পারেন; কিন্তু তিন মিনিটেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভালবাসিতে পারেন না। এই সংসার ভালবাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহা জানিবে কিরূপে? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে, উহাতে আদানপ্রদান বা লাভক্ষতির প্রশ্ন নাই। কিছু পাইবার জন্য যখন একজন অপরকে ভালবাসে, জানিবেন—উহা ভালবাসা নয়, দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনা-বেচার কথা, সেখানে আর ভালবাসা নাই। অতএব যখন কেহ 'ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, জানিবেন—তাহা ভালবাসা নয়। কি করিয়া হইবে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্তুতি উপহার দিলাম, তুমি তাহার পরিবর্তে আমাকে কিছু দাও—ইহা তো দোকানদারি মাত্র।

এক রাজা বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া রাজা এত খুশী হইলেন যে, তিনি সাধুকে তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপহার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, 'না, আমি নিজের অবস্থায় খুব সন্তুষ্ট আছি। এই-সব বৃক্ষ হইতে খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল পাই, এই-সব সুন্দর পবিত্র নদী হইতে প্রয়োজন- মত জল পাই, এই-সব গুহায় নিদ্রা যাই। যদিও তুমি রাজা, তথাপি তোমার প্রদত্ত উপহার আমি গ্রাহ্য করি না।' রাজা বলিলেন, 'শুধু আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক একবার আমার রাজধানীতে আসুন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু রাজার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে চতুর্দিকে সোনা, হীরা, মণিমাণিক্য, জহরত এবং আরও

অনেক অদ্ভুত বস্তু ছিল। চারিদিকে ঐশ্বর্য-বৈভবের চিহ্ন। রাজা বলিলেন, 'আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি প্রার্থনা শেষ করিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি গৃহের এক কোণে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভো, আমাকে আরও ঐশ্বর্য দাও, আরও সন্তানসন্ততি দাও, রাজ্য দাও।' ইতোমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, 'দাঁড়ান, আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পার? তুমি নিজেই সর্বদা ভিক্ষা করিতেছ!' ঐরূপ প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নয়। যদি ভগবানের নিকট ইহা-উহা প্রার্থনা কর, তবে প্রেমে ও দোকানদারিতে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রেমের প্রথম লক্ষণ এই—উহাতে কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, প্রেম সর্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা নয়। ভগবানের প্রকৃত সন্তান বলেন, 'ভগবান্ যদি চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্বস্ব দিতে পারি কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না, এই জগতের কোন জিনিষই আমি চাই না। তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাসি, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। কে জানিতে চায়—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ কিনা? আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাই না এবং তাঁহার শক্তির কোন প্রকাশও দেখিতে চাই না। তিনি প্রেমের ভগবান্—এটুকু জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাই না।'

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। প্রেমে কি কোন ভয় থাকিতে পারে? মেষশিশু কি কখনও সিংহকে ভালবাসে? না—মূষিক বিড়ালকে? না—দাস প্রভুকে ভালবাসে? ক্রীতদাসগণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা কি ভালবাসা? ভয়ের মধ্যে ভালবাসা কোথায় দেখিয়াছেন? উহা ভান মাত্র বুঝিতে হইবে। যতদিন মানুষ ভগবানকে মেঘের উপর আসীন, এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড দিতেছেন বলিয়া চিন্তা করে, ততদিন কোন ভালবাসা সম্ভব নয়। ভালবাসার সহিত কখনও ভয়ের ভাব থাকিবে না। ভাবিয়া দেখুন—একজন তরুণী জননী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতেছে—অমনি তিনি

সামনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, পরদিনও তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সঙ্গে তাঁহার শিশুসন্তান। আরও মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া শিশুটিকে আক্রমণ করিল; তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি? তখন তাঁহার শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সিংহের মুখেই যাইবেন। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ পুরস্কারদাতা না দণ্ডদাতা—ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রকৃত প্রেমিক কখনও এভাবে চিন্তা করে না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কিভাবে দেখেন? পত্নী তাঁহাকে বিচারপতি, পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা-রূপে দেখেন না—তাঁহাকে স্বামী বলিয়া, প্রেমাস্পদ বলিয়াই দেখেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহাকে কি ভাবে দেখে? স্নেহময় পিতা বলিয়াই দেখে, পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপে ভগবানের সন্তানরাও কখনও ভগবানকে পুরস্কারদাতা বা দণ্ডবিধাতা-রূপে দেখেন না। বাহিরের লোক—যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই, তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁহার ভয়ে সর্বদা কাঁপিতে থাকে। এ-সব ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করুন। ভগবান্ পুরস্কারদাতা বা দণ্ডদাতা—এ-সব ভাব ভয়াবহ; যাহারা বর্বর-প্রকৃতি, তাহাদের পক্ষে হয়তো এগুলির কিছু উপযোগিতা থাকিতে পারে। অনেক লোক—খুব বুদ্ধিমান্ লোকও ধর্মজগতে বর্বরতুল্য, সুতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্মভাব জাগরিত হইয়াছে, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ও-সব ভাব শুধু ছেলেমানুষি, বোকামি। এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর। প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করে, যখন সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, প্রেমই সর্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে কতই তো দেখিতে পাই, পরমা সুন্দরী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে! আবার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সুন্দর পুরুষ এক অতি কুৎসিতা নারীকে ভালবাসিতেছে! সেখানে কিসের আকর্ষণ? বাহিরের লোক তাহাদের মধ্যে কুৎসিত নারী

বা পুরুষকেই দেখিতে পায়—প্রেমিককে দেখিতে পায় না, কখনও তাহা দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। কিরূপে ইহা হয়? যে নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, সে তাহার নিজ মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে আদর্শ আছে, তাহাই লইয়া যেন ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করে, সে যে ঐ কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নয়, সে তাহার নিজ আদর্শেরই পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ্যমাত্র, এবং সেই উপলক্ষ্যের উপর সে তাহার নিজ আদর্শ প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই ভালবাসা, সেখানেই এ-কথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের অনেকেরই ভাই-ভগিনী দেখিতে খুবই সাধারণ, কিন্তু আমাদের ভাই-ভগিনী বলিয়াই তাহারা আমাদের নিকট পরম সুন্দর।

এই-সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেকেই নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করে। এই বহির্জগৎ উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করি মাত্র। একটা শুক্তির খোলার ভিতর একটু বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভিতর একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাহার ফলে শুক্তি হইতে রস নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালুকণাকে আবৃত করে। এইরূপে সুন্দর মুক্তা উৎপন্ন হয়। আমরাও ঠিক তাই করিতেছি। বহির্জগতের বস্তুসকল বালুকণার মত আমাদের চিন্তার উপলক্ষ্য মাত্র—ঐগুলির উপর আমরা আমাদের নিজেদের ভাব আরোপ করিয়া বাহ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে ঘোর নরক-রূপে দেখে, ভাল লোকেরা ইহাকেই পরম স্বর্গ মনে করে। এই জগৎকে প্রেমিকেরা প্রেমপূর্ণ এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ জগতে বিবাদ-বিরোধ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ শান্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং আমরা সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করিয়া থাকি, এবং যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করিতে পারি, তখন আমাদের তর্কযুক্তি ও সন্দেহ সব চলিয়া

যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে কিনা, এ-কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? আদর্শ তো কখনও নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি, শুধু তখনই ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করি, এবং যেহেতু আমি আমার অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পারি না, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারি না। আমার বাহিরে কোন স্থানে অবস্থিত, খেয়াল অনুযায়ী জগৎ-শাসনকারী, কয়েকদিন সৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব—বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারুক বা না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ-দয়াময় হইতে পারেন কিনা, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্ মানুষের পুরস্কারদাতা কিনা, এবং তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারীর চোখে অথবা দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই ভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি এই-সব শাস্তির, ভয় ও সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট, এবং এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

কোন্ শক্তিবলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবর্তিত হইতেছে? কোন্ শক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীবজন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে—যেন সমুদয় জগৎকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে? ইহাকেই 'প্রেম' বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি—সকলের মধ্যেই এই ভগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার প্রেরণাতেই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্যের কথা, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কারণ এই-সবের মূলেও ঐ প্রেম, যদিও তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

ইহাই জগতে একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। চোরের প্রেম টাকার উপর—প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা বিপথে চালিত হইয়াছে। এইরূপে সর্বপ্রকার পাপকর্ম ও সমুদয় পুণ্য—সব কিছুর পশ্চাতেই সেই অনন্ত শাশ্বত প্রেম বিদ্যমান। মনে করুন, একজন একই ঘরে বসিয়া নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, এবং ঠিক সেই সময়েই আর একজন তাহার বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুই জন লিখিতেছে, কিন্তু যে যেভাবে আলো ব্যবহার করিতেছে, সেই সে-জন্য দায়ী হইবে—আলোর কোন দোষ-গুণ নাই। এই প্রেম সর্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইহাই সমগ্র জগতের প্রেরণা-শক্তি—ইহার অভাবে জগৎ মুহূর্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পতিকে ভালবাসে; কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে; কেহই কোন বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালবাসে।৩০ এমন কি, অতি-নিন্দিত এই স্বার্থপরতা, তাহাও সেই প্রেমেরই প্রকাশ। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, ইহাতে মিশিয়া যাইবেন না, শুধু এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলী—দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত এই বিচিত্র নাটক দেখিয়া যান, এবং এই অপূর্ব ঐকতান শ্রবণ করুন—সবই সেই এক প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও আত্মা বা 'অহং'-ভাব ক্রমশঃ বাড়ীতে থাকে। সেই এক 'অহং'—একটি মানুষ বিবাহিত হইলে দুইটি হইবে, সন্তানাদি হইলে কয়েকটি হইবে; এইরূপে তাহার 'অহং'-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে; গ্রাম, নগর অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সেই আত্মা সকল নরনারী, সকল শিশু, সকল জীবজন্তু, সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে মিলিত করে, উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এক সর্বজনীন প্রেমে—অনন্ত প্রেমে পরিণত হইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

এইরূপে আমরা পরা ভক্তিতে উপনীত হই—এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত

হইতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন? সকল গির্জা-মন্দিরাদি তো তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় গির্জা কোথায়, যাহা তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি নিজেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। যে অসীম প্রেমের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর সীমা আছে? যে-সকল ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই-সব ধর্মে প্রেমকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি—এই বিভিন্ন আসক্তি ও আকর্ষণ-পূর্ণ জগতে সবই সেই অনন্ত প্রেমের আংশিক বা অন্যভাবের প্রকাশ মাত্র, তথাপি আমরা সর্বদা উহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। বিভিন্ন দেশের সাধুমহাপুরুষগণ উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ঐ প্রেমের তাৎপর্য এতটুকু প্রকাশ করিবার জন্যও ভাষার ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন—এমন কি অতিশয় ইন্দ্রিয়ভোগ-বাচক শব্দগুলি পর্যন্ত দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহার ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি৩১ এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও এইভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেনঃ 'হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়ীতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হয় এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।'৩২ ইহাই প্রেমিকের উন্মত্ত অবস্থা—এই অবস্থায় সব বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন—মুক্তি কে চায়? কে মুক্ত হইতে চায়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্বাণপদের অভিলাষ করে?

'আমি ধন চাই না, আমি স্বাস্থ্যও প্রার্থনা করি না, আমি রূপ যৌবনও চাই না, আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিও কামনা করি না—এই সংসারে সমুদয় অশুভের মধ্যেও আমার পুনঃপুনঃ জন্ম হউক—আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যেন অহেতুক প্রেম থাকে।'৩৩ এই প্রেমের উন্মত্ততাই পূর্বোক্ত সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সর্বোচ্চ, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, প্রবলতম ও অতিশয়

মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধুমহাপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেম-মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান—তাঁহারা 'ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত' হইতে চান। সকল ধর্মের সাধুমহাপুরুষগণ যে প্রেম-মদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চান না—প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, এবং কি অপূর্ব এই পুরস্কার! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূরীভূত হয়; ইহাই একমাত্র পানপাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় যে, সে মানুষ।

শেষে আমরা দেখিতে পাই—বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে পূর্ণ একত্বরূপ এক কেন্দ্রের অভিমুখী। আমরা চিরকালেই দ্বৈতবাদিরূপে সাধন আরম্ভ করি—ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। এই দুয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্‌ও যেন মানুষের দিকে আসিতে থাকেন। পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতির ভাব মানুষ ভগবানের উপর আরোপ করে এবং যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা লাভ করে। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়! দেখা যায় তোমাকে উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা করা হয়, আর আমাকে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা করি। সেই অবস্থায় পৌঁছিলেই মানুষ—যে-অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্বোচ্চ পরিণতি দেখিতে পায়। যেখান হইতে মানুষ আরম্ভ করে, সেইখানেই শেষও করিয়া থাকে। প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র 'অহং' বলিয়া ভ্রম হওয়াতে ভালবাসাও স্বার্থপর ছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোক প্রকাশ পাইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানে অবস্থিত পুরুষবিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনন্তপ্রেমে পরিণত হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যান, ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাঁহার যে-সব বৃথা বাসনা ছিল, তখন তিনি সেগুলি

পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, এবং প্রেমের চরমশিখরে আরোহণ করিয়া সাধক দেখিতে পান—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ—এক ও অভিন্ন।